টুকুনজিল

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১. লাল গাড়ি

আমি আর বাবা বাজার করে ফিরে আসছিলাম। বাজারের বড় ব্যাগটা আমার হাতে, বাবার হাতে একটা মাঝারি বোয়াল মাছ। বাবা বোয়াল মাছটাকে উপরে তুলে ধরে রেখে সেটার সাথে কথা বলছেন। তাঁর একটু মাথা-খারাপের ভাব আছে, এটা হচ্ছে তার এক নম্বর লক্ষণ। জন্তু-জানোয়ার, পশুপাখি, গাছপালা সবার সাথে কথা বলেন। বোয়াল মাছটাকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা বোয়াল মিয়া, আপনার শরীরটা ভালো? কোন গাং থেকে এসেছেন?

মাছটি মনে হয় এক্ষুণি ধরে এনেছে, এখনো জ্যান্ত। বাবার কথা শুনেই কি না জানি না, দুর্বলভাবে লেজটা একবার নেড়ে দিল। বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন, আপনি বাস্তবিকই সত্যি কথা বলেছেন। বীন গাঙের পানি বড়ই ঘোলা। আপনার বেশি কষ্ট হয় নাই তো?

মাছটির আলাপে বেশি উৎসাহ নেই দেখে বাবা সেটাকে একবার ঝাঁকিয়ে দিলেন, তারপর সেটাকে কানের কাছে ধরে রেখে কিছু-একটা শুনে ফেললেন। মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, খাওয়াদাওয়ার কষ্ট? সেটা কার নাই বলেন, তোমাদের সাথে মানুষ পর্যন্ত না খেয়ে রাস্তায় মরে আছে—

আমি বললাম, বাবা, তুমি আসলেই মাছের কথা শুনতে পাও?

বাবা অবাক হয়ে বললেন, কেন শুনতে পাব না?

কেমন করে শোন?

ওরা বলে, তাই শুনি।

আমরা তো শুনি না।

বাবা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, শুনতে চাইলে সবাই শুনতে পারে। কেউ তো শুনতে চায় না।

তুমি আমাকে শোনাতে পারবে?

বাবা চোখ উজ্জ্বল করে বললেন, কেন পারব না? এক শ' বার পারব। তুই শুনবি?

আমি বললাম, শুনব।

বাবা বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে বললেন, নে, ব্যাগটা রাখ্। তারপর চোখ বন্ধ করে গাছের সাথে তোর কানটা লাগা। যখন গাছের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পারবি তখন বলবি, জনাব গাছ, আপনার শরীরটা ভালো?

আমি বললাম, আপনি করে কেন বলতে হয়?

কত বয়স গাছের, সম্মান করে কথা বলতে হয় না? নে, ব্যাগটা আমার হাতে দে।

সড়ক দিয়ে আরো কত লোকজন যাচ্ছে-আসছে এর মাঝে চোখ বন্ধ করে গাছের সাথে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি কেমন করে? এমনিতেই বাবার একটু মাথা-খারাপ বলে আমাদের কত যন্ত্রণা, চেনা কেউ-একজন দেখে ফেললে কোনো উপায় আছে? আমি বললাম, আজ থাক বাবা, আরেকদিন শুনব।

বাবার মন-খারাপ হল, মুখটা কালো করে বললেন, এই জন্যে তোরা শুনতে পারিস না, তোদের শোনার আগ্রহ নাই।

বাবা আরো কী বলতে চাইছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দূরে কী দেখে থেমে গেলেন। আমিও তাকালাম, দূরে ধুলা উড়িয়ে সড়ক দিয়ে শব্দ করে কী-একটা আসছে। গ্রামের সড়ক, একটা দুইটা রিকশা ছাড়া কিছু যায় না। মাঝে মাঝে পাশের গঞ্জ থেকে একটা পুরানো ট্রাক আসে। মেম্বার সাহেব একটা মোটর সাইকেল কিনেছেন, তাঁর বড় ছেলে মাঝে মাঝে ফটফট শব্দ করে চালিয়ে বেড়ায় এর বেশি কিছু নেই। আমিও তাকিয়ে রইলাম, প্রচণ্ড শব্দ করে ধুলা উড়িয়ে লাল রঙের একটা গাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এই সড়ক দিয়ে গাড়ি খুব একটা আসে না, আশেপাশে যারা ছিল সবাই হাঁ করে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল।

বাবাও খানিকক্ষণ অবাক হয়ে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ইস্! কী একটা জিনিস!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ি যায় কেমন করে, বাবা?

বাবা অনেকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, ভিতরে এদের হয় পাওয়ার আছে। যখন পাওয়ার সামনে দেয় তখন সামনে যায়, যখন পিছনে দেয় তখন পিছনে যায়। পাওয়ার হচ্ছে বড় জিনিস, যার পাওয়ার নাই তার কিছু নাই।

কথাটার কি মানে আমি ঠিক বুঝলাম না, পাগল মানুষ; যখন যেটা মনে হয় সেটা বলে ফেলেন, লোকজন শুনে হাসাহাসি করে। খুব খারাপ লাগে তখন। আমার যখন অনেক পয়সা হবে তখন বাবাকে চিকিৎসা করাতে নিয়ে যাব, আজকাল নাকি পাগলের চিকিৎসা হয়।

বাবার জন্য আমার বড় কষ্ট হয়।

বাড়ির সামনে এসে দেখি সেখানে মহা ভিড়। লাল গাড়িটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর সেটাকে ঘিরে অনেক লোকজন। সবাই গাড়িটা একবার ছুঁয়ে দেখতে চায়। কালো প্যান্ট পরা একজন মানুষ—নিশ্চয়ই গাড়ির ড্রাইভার হবে, মুখের কোনে একটা সিগারেট কামড়ে ধরে হুঙ্কার দিয়ে বলছে, খবরদার, কেউ কাছে আসবে না, একেবারে জানে মেরে ফেলব।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম যে, ছোট বাবা এসেছেন। ছোট বাবা হচ্ছেন

==

আমাদের বড়লোক আত্মীয়দের মাঝে এক নম্বর। চেহারা খুব ভালো বলে নানাজান অনেক বড় ঘরে বিয়ে দিয়েছিলেন। ছোট খালু ইঞ্জিনিয়ার, জার্মানি বা আমেরিকা কোথায় জানি গিয়েছিলেন, সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছেন। এটা নিশ্চয়ই সেই গাড়ি।

আমি প্রায় ছুটে ভিতরে ঢুকে গেলাম, বাইরে যেরকম ভিড়, ভিতরেও সেরকম ভিড়। উঠানের মাঝখানে একটা চেয়ারে ছোট খালা বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে পাড়ার সব বৌ-ঝিরা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট খালা দরদর করে ঘামছেন, রাঙা বুবু একটা হাতপাখা দিয়ে তাঁকে প্রাণপণে বাতাস করে যাচ্ছে। ছোট খালা একসময়ে নাকি খুব সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু এখন আর দেখে বোঝা যায় না, মোটা হয়ে গোল একটা কলসির মতো হয়ে গেছেন। গায়ের রং অবশ্যি ধবধবে ফর্সা, কেমন যেন একটা গোলাপী আভা। তার পাশে আমার মা'কে দেখাচ্ছিল শুকনা, কালো এবং অনেক বেশি বয়স।

আমি ছোট খালু কিংবা তাঁদের ছেলেমেয়েদের খুঁজে পেলাম না, মনে হয় ড্রাইভারকে নিয়ে একাই এসেছেন। মা তাঁর ছোট বোনকে দেখে খুব খুশি হয়েছেন, কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আমাকে দেখে বললেন, বিলু, তোর ছোট খালাকে সালাম কর।

আমি ব্যাগটা রেখে ছোট খালাকে সালাম করতে এগিয়ে যেতেই ছোট খালা পা গুটিয়ে নিয়ে বললেন, থাক, থাক, সালাম করতে হবে না।

আমি তবুও হামলে পড়ে সালাম করে ফেললাম। ছোট খালা বললেন, তুই বিলু কত বড় হয়েছিস দেখি!

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে শুধু বোকার মতো একটু হাসলাম। ছোট খালা বললেন, স্কলারশিপ পেয়েছিস শুনলাম, খুব ভালো, খুব ভালো।

মা বললেন, এই সংসারে কি পড়ার সময় পায়? তার মাঝে বৃত্তি পেয়ে গেল, ডিস্ট্রিক্টের মাঝে এক নাম্বার।

মা এমনভাবে বললেন যে শুনে আমি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলাম। কিছু-একটা বলতে হয়, কিন্তু কী বলব বুঝতে পারলাম না, পায়ের নখ দিয়ে উঠানের মাটি খুঁচিয়ে তুলতে থাকলাম। মা জিজ্ঞেস করলেন, তোর বাবা কই?

বাইরে। গাড়ি দেখছেন। কী সুন্দর গাড়ি মা! তুমি দেখেছ?

ছোট খালা খুশি হয়ে বললেন, কই আর সুন্দর! মেটাল কালার চাচ্ছিলাম, পাওয়াই গেল না।

মা বললেন, তোর বাবাকে ডেকে আন্ গিয়ে, যা!

আমি ছুটে বের হয়ে গেলাম।

বাবা ছোট খালাকে দেখেই বললেন, শানু, তুমি এত মোটা হলে কেমন করে? ভালোমন্দ অনেক খাও মনে হয়!

বাবা পাগল মানুষ, কখন কী বলতে হয় জানেন না, যখন যেটা মুখে আসে বলে ফেলেন। বাবার কথা শুনে ছোট খালা একেবারে পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে গেলেন। তাই দেখে মা খুব রেগে গেলেন, বললেন, কী-সব কথা বলেন আপনি, মাথামুণ্ডু কিছু নাই।

==

বাবা মুখ গম্ভীর করে বললেন, ভুল বলছি আমি? তুমি তো মোটা হও নাই—হয়েছ? ভালোমন্দ খেতে পাও না, কেমন করে মোটা হবে?

মা লজ্জায় একেবারে মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে বললেন, আপনি এখন যান তো দেখি।

ঠিক তখন একটা মোরগ কঁক কঁক করে ডেকে উঠল, হয়তো আকাশে একটা চিল উড়ে যেতে দেখেছে বা অন্য কিছু। বাবা লাফিয়ে উঠে বললেন, ঐ দেখ, মোরগটাও বলেছে, দেখেছ? দেখেছ?

বাবা মোরগটার দিকে এগিয়ে গেলেন, ভুল বলেছি আমি? ভুল বলেছি?

লজ্জায় দুঃখে মায়ের চোখে একেবারে পানি এসে যাচ্ছিল। ছোট খালা সামলে নিয়ে বললেন, দুলাভাই তো দেখি একেবারে বদ্ধ পাগল। বুবু, তোমার একি অবস্থা? ছেলেপুলে নিয়ে কী করবে তুমি?

মা লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আল্লাহ্ দিয়েছে, আল্লাহ্ দেখবে।

আমি আস্তে আস্তে বাইরে চলে এলাম, মনটা কেন জানি খারাপ হয়ে গেল।

দুপুরবেলা খেতে বসে ছোট খালা শুধু ছটফট করলেন। বাসায় চেয়ার-টেবিলে বসে খান, এখানে মেঝেতে মাদুর পেতে বসতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে। ছোট খালা বেশি কিছু খেলেনও না, খাবারগুলো শুধু হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করলেন। এত কম খেয়ে ছোট খালা এত মোটা হলেন কেমন করে কে জানে।

খাবারের মাঝামাঝি হঠাৎ ছোট খালা বললেন, বুবু, বিলুকে নিয়ে যাই আমার সাথে, ঢাকায় থেকে পড়াশোনা করবে।

আমার নিজের কানকে বিশ্বাস হল না, এত বড় কপাল কি আমার সত্যি কখনো হবে? মায়ের মুখের দিকে তাকালাম, মা কি রাজি হবেন? যদি না বলে বসেন?

মা কোনো উত্তর না দিয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বাবার দিকে তাকালেন। বাবা বোয়াল মাছের মাথাটা খুব যত্ন করে চুষছেন, ছোট খালার কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না।

ছোট খালা আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী বল, বুবু?

উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হল। ছোট খালার বাসায় থাকব আমি? লাল গাড়ি করে যাব-আসব আমি? ফ্রিজ থেকে বরফ বের করে খাব? আমি আবার মায়ের মুখের দিকে খুব আশা নিয়ে তাকালাম। মা খানিকক্ষণ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে খুব আস্তে আস্তে বললেন, ঠিক আছে শানু।

আমার ইচ্ছে হল খুশিতে একটা লাফ দিই, অনেক কষ্ট করে নিজেকে থামিয়ে রাখলাম।

ছোট খালা বললেন, আজই চলুক আমার সাথে। গাড়ি করে চলে যাবে।

মা একটু চমকে উঠে বললেন, আজই?

আমি উদগ্রীব হয়ে বললাম, হ্যাঁ মা, যাই?

মায়ের মুখে কেমন জানি একটা দুঃখের ছায়া পড়ল। আবার বাবার দিকে তাকালেন, বাবা তখনো গম্ভীর মুখে মাছের মাথাটা চুষছেন। মা খুব আস্তে আস্তে, প্রায় শোনা যায় না স্বরে বললেন, ঠিক আছে শানু।

==

গাড়ির চারদিকে সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার জোরে জোরে দুইটা হর্ন দিল, তবু সামনে থেকে কেউ নড়ল না। ড্রাইভার চাবি ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট দিতেই সবাই একটু সরে দাঁড়াল। বড়রা তখন ছোট বাচ্চাদের ঠেলে ঠেলে সরিয়ে গাড়িটা যাবার একটা জায়গা করে দিল। আমি গাড়ির সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছি, ছোট খালা বসেছেন পিছনে। গাড়ির পিছন থেকে সবকিছু অন্যরকম দেখায়। নিজেকে কেমন জানি রাজা রাজা মনে হয়।

আমি বাড়ির ভিতরে তাকালাম, বেড়ার ফাঁক দিয়ে মা তাকিয়ে আছেন। মায়ের চোখে আঁচল। মায়ের পিছনে রাঙাবুবু। বড় বুবু শ্বশুরবাড়ি থেকে আসতে পারে নি। লাবুটা বোকার মতন চিৎকার করে কাঁদছে, সেও আমার সাথে গাড়ি করে যেতে চায়। রশীদ চাচা তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। এক পাশে দুলাল আমার লাইব্রেরির বই কয়টা শক্ত করে বুকে চেপে ধরে রেখে কেমন জানি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। দুলাল হচ্ছে আমার প্রাণের বন্ধু—এরকম হঠাৎ করে এভাবে চলে যাব সে এখনো বিশ্বাসই করতে পারছে না। দুলালকে আমি সবকিছু বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি, আমার লাইব্রেরির সবগুলো বই, আমাদের গ্রিন বয়েজ ক্লাবের ফুটবলটা, দেয়াল-পত্রিকার লেখাগুলো। এতগুলো ঝামেলা সে একা কেমন করে সামলাবে কে জানে।

ড্রাইভার ঠিক যখন গাড়িটা ছেড়ে দিচ্ছে তখন হঠাৎ কোথা থেকে জানি বাবা এসে হাজির হলেন। গাড়ির জানালা দিয়ে অবাক হয়ে ভিতরে আমার দিকে তাকালেন। তারপর অবাক হয়ে বললেন, এইটা কে, বিলু না?

আমি মাথা নাড়লাম।

বাবা বললেন, ভিতরে বসে আছিস যে? গাড়ি যে ছেড়ে দেবে এক্ষুনি—

আমি বললাম, বাবা, আমি তো ছোট খালার সাথে যাচ্ছি।

কী বললি?

আমি ছোট খালার সাথে যাচ্ছি।

কোথায়—

আমি কিছু বলার আগেই ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিল। ধুলা উড়িয়ে বাবাকে পিছনে ফেলে গাড়ি ছুটে চলে গেল সামনে। আমি পিছনে তাকিয়ে দেখলাম বাবা অবাক হয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমার প্রথমবার কেমন জানি একটু মন-খারাপ হয়ে গেল।

২. বল্টু

ছোট খালার বড় ছেলের নাম বল্টু। ভালো একটা নাম আছে, শাহনাওয়াজ খান না কি যেন, কিন্তু সবাই তাকে বল্টু বলেই ডাকে। বল্টু কারো নাম হয় আমি জানতাম না, কিন্তু তাকে দেখে মনে হল বল্টু নামটা তার জন্যে একেবারে মানানসই। গাট্টাগোট্টা শরীর, মাথাটা ধড়ের উপর বসানো। বয়সে আমার সমান কিন্তু লম্বায় আমার থেকে

অন্তত আধহাত ছোট। আমাকে প্রথমবার দেখে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, এইটা কে?

ছোট খালা বললেন, বিলু, তোর খালাতো ভাই।

যার বাবা পাগল?

ছোট খালা ধমক দিয়ে বললেন, ছিঃ। এইভাবে বলে না।

বল্টু মুখ গোঁজ করে জিজ্ঞেস করল, কতদিন থাকবে?

ছোট খালা বললেন, ছিঃ বল্টু! এইভাবে কথা বলে না।

তার মানে অনেক দিন। বল্টু মুখ লম্বা করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, কোন ক্লাসে পড়ে?

আমি উত্তর দিলাম, বললাম, সেভেন।

রোল নাম্বার কত?

এক।

সাথে সাথে বল্টুর মুখটা কালো হয়ে গেল। প্রথমে দেখা হওয়ামাত্র কাউকে তার রোল নাম্বার জিজ্ঞেস করা মনে হয় ঠিক না। কিন্তু আমাকে যখন জিজ্ঞেস করেছে, আমি কেন করব না? কারো রোল নাম্বার তো আর এক থেকে কম হতে পারে না। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার রোল নাম্বার কত?

বল্টু উত্তর দেবার আগেই তার ছোটজন মিলি একগাল হেসে বলল, ভাইয়া পরীক্ষায় লাড্ডা গাড্ডা! সব সাবজেক্টে রসগোল্লা!

বলামাত্র বল্টু তার ছোট বোনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা তুলকালাম কাণ্ড শুরু করে দিল।

আমি বুঝতে পারলাম, এই বাসায় বল্টু হবে আমার শত্রুপক্ষ। নিয়ম অনুযায়ী মিলি হওয়া উচিত মিত্রপক্ষ, কিন্তু এসব ব্যাপারে কিছু জোর দিয়ে বলা যায় না।

রাতে খাবার টেবিলে ছোট খালুর সাথে দেখা হল। অনেক দিন আগে জার্মানি না আমেরিকা থেকে একটা রঙিন ছবি পাঠিয়েছিলেন। সেই ছবিতে ছোট খালু সারা গায়ে জাব্বাজোব্বা জড়িয়ে একটা শাবল দিয়ে বাসার সামনে বরফ পরিষ্কার করছিলেন। ধবধবে সাদা বরফের সামনে তাকে দেখাচ্ছিল বেগুনি রঙের। মানুষের রং বেগুনি হয় কেমন করে সেটা নিয়ে আমার সবসময়েই একটু কৌতূহল ছিল। আজ দেখলাম রংটা বেগুনি নয়, তবে একটু কালোর দিকে। আমার সাথে ছোট খালুর একটু কথাবার্তা হল। জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ির সবাই ভালো?

জ্বি।

তোমরা তো চার ভাই-বোন?

জ্বি।

শিউলি, রানু, তারপর তুমি। তোমার পরে একজন ভাই।

জ্বি।

ভাইয়ের নাম যেন কি?

লাবু। ভালো নাম আতাউল করিম।

ও আচ্ছা। বেশ বেশ। ছোট খালু খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন, শিউলির তো

===

বয়স বেশি না, এর মাঝে বিয়ে হয়ে গেল?

জ্বি।

পড়াশোনাটা শেষ করলে হত।

ছোট খালা নাক দিয়ে ফোঁৎ করে একটা নিঃশ্বাস বের করে বললেন, গ্রামের ব্যাপার, ঢ্যাঙা একটা মেয়েকে স্কুলে পাঠাবে কেমন করে?

ছোট খালু বললেন, পড়াশোনায় তো ভালো ছিল, তাই না?

জ্বি।

খালু চুকচুক শব্দ করে বললেন, মেয়েদের পড়াশোনাটা খুব দরকার, খুব দরকার।

ছোট খালু মানুষটাকে দেখে রাগী রাগী মনে হয়, কিন্তু আসলে মনে হয় রাগী নয়। মনটা খুব ভালো। একবার মনে হল সত্যি কথাটি বলে দিই, যে, বাবা পাগল বলে বড় বুবুর বিয়ের কোনো প্রস্তাবই আসছিল না। তাই যখন বিয়ের একটা প্রস্তাব এসেছে, তাড়াহুড়ো করে সবাই মিলে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমি কিছু বললাম না, বাবার পাগলামি নিয়ে কোনো কথা বলতে আমার একেবারে ভালো লাগে না।

রাত্রে ঘুমানোর সময় একটা সমস্যা দেখা দিল, আমি কোথায় ঘুমাব সেটি ঠিক করা হয় নি। মিলি আর বল্টুর আলাদা ঘর, দু'জনের জন্যে দুটি আলাদা বিছানা। ছোট খালা আমাকে বল্টুর সাথে শোওয়ার কথা বলামাত্রই সে নাক ফুলিয়ে একরকম ফোঁস ফোঁস জাতীয় শব্দ শুরু করে দিল। ছোট খালু কড়া স্বরে বল্টুকে কী-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে থামিয়ে বললাম, খালু, আমি কি নিচে শুতে পারি?

নিচে? মেঝেতে?

জ্বি। একটা বালিশ আর একটা চাদর হলেই হবে।

ছোট খালু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, আমার আসলে একলা শোয়াই ভালো।

কেন?

আমি নাকি ঘুমের মাঝে শুধু উল্টাপাল্টা করি। রাঙাবুবু বলেছে। আমি অবশ্যি টের পাই না। কিন্তু যে আমার সাথে ঘুমায় সে টের পায়।

মিলি বলল, কিন্তু ভাইয়ার মতো তো আর তুমি বিছানায় পি—

বল্টু একটা হুঙ্কার দিল বলে মিলি কথা শেষ করতে পারল না, কিন্তু শব্দটা নিশ্চয়ই 'পিশাব'-ই হবে।

আমাকে সে-রাতের মতো মেঝেতে বিছানা করে দেয়া হল। নিচে তোশক তৈরি করা হয়েছে একটা লেপ ভাঁজ করে। মশারিটাও টানাতে হয়েছে খুব কায়দা করে, তিনটি কোনা উঁচু, কিন্তু চার নাম্বার কোনাটি ঝুলে পড়ে সেটাকে একটা কালবোশেখির ঝড়ে ভেঙে-পড়া বাসার মতো দেখাতে লাগল।

রাতে একা-একা বিছানায় শুয়ে রইলাম। বাড়িতে আমি আর লাবু রাঙাবুবুর সাথে ঘুমাই। ঘুমানোর আগে লাবু বলে, রাঙাবুবু, একটা গল্প বল।

আমি কিছু বলি না, এত বড় হয়ে গেছি, গল্প বলার কথা বলি কেমন করে? রাঙাবুবু প্রথমে বলে, ঘুমা ঘুমা, কত রাত হয়েছে দেখেছিস?

==

লাবু তখন ঘ্যান ঘ্যান শুরু করে, তখন আমিও বলি, বল্‌-না একটা গল্প, রাঙাবুবু।

আমি শুনতে চাইলে রাঙাবুবু খুব খুশি হয়, তখন বলে, কোনটা শুনবি?

আমি কোনোদিন বলি রবিনসন ক্রুসো, কোনোদিন বলি যখের ধন। সব বই আমিও পড়েছি, রাঙাবুবুর জন্যে বই তো আমিই আনি লাইব্রেরি থেকে। সব আমার জানা গল্প, তবু রাঙাবুবুর মুখ থেকে শুনতে এত ভালো লাগে! সব যেন একেবারে চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে যায়।

রাঙাবুবু যখন গল্প শুরু করে, কী ভালোই না তখন লাগে।

আজকে আমি একা। ঘরে কি সুন্দর একটা নীল বাতি জ্বলছে, সবকিছু আবছা আবছা দেখা যায়, মনে হয় ঘরের ভিতর যেন জোছনা হয়েছে। কেমন জানি অবাস্তব মনে হয় সবকিছু। ঘুমের মাঝে বল্টু নড়াচড়া করছে, শুনলাম দাঁত কিড়মিড় করে বিড়বিড় করে বলছে, ফাটিয়ে ফেলব, একেবারে ফাটিয়ে ফেলব।

কে জানে আমাকে লক্ষ করেই বলছে কি না!

৩. নূতন স্কুল

বল্টুর স্কুলে সিট পাওয়া গেল না বলে আমাকে অন্য একটা স্কুলে ভর্তি করা হল, স্কুলটা বাসা থেকে বেশ দূরে। নূতন স্কুলে আমাদের ক্লাস-টিচারের বেশ বয়স। চোখে চশমা, মুখে গোঁফ এবং কেমন জানি একটু রাগী রাগী চেহারা। প্রথম দিন আমাকে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত একনজর দেখে হুঙ্কার দিয়ে বললেন, নাম কি?

বিলু বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে ভালো নামটি বললাম, নাজমুল করিম।

বাসায় কী ডাকে? নাজমুল, না করিম?

বাসায় ডাকে বিলু।

বিলু? স্যার হাত নেড়ে বললেন, মাথায় কি আছে ঘিলু?

ক্লাসের সবাই হো হো করে হেসে উঠল, তখন আমিও একটু সহজ হলাম। স্যারের চেহারাটা রাগী রাগী, কিন্তু মানুষটা মনে হয় খুব ভালো। স্যার জিজ্ঞেস করলেন, কোন স্কুল থেকে এসেছিস?

নীলাঞ্জনা হাই স্কুল।

নীলাঞ্জনা? বাহ্‌, কী সুন্দর নাম। কোথায় স্কুলটা?

আমাদের গ্রামে। রতনপুর স্টেশন থেকে চার মাইল পুব দিকে।

রতনপুর? সেটা কোথায়?

আমার খানিকক্ষণ লাগল স্যারকে বোঝাতে জায়গাটা কোথায়। ভেবেছিলাম চিনবেন না, কিন্তু অবাক ব্যাপার, স্যার ঠিকই চিনলেন। মাথা নেড়ে বললেন, তুই তো তাহলে একেবারে একটা গ্রামের স্কুল থেকে এসেছিস! ভেরি ইন্টারেস্টিং। কী রকম পড়াশোনা হয় আজকাল বল্‌ দেখি?

ভালোই হয়।

==

ছাত্র কয়জন?

আমি মাথা চুলকালাম, স্কুলে ছাত্র কয়জন কখনো তো বের করার চেষ্টা করি নি। অ্যাসেম্বলির সময় মাঠের আধাআধি প্রায় ভরে যায়—কিন্তু সেটা তো উত্তর হতে পারে না। ইতস্তত করে বললাম, অনেক।

অনেক? এটা আবার কী রকম উত্তর হল? একটা নাম্বার বল্।

জানি না স্যার।

তোর ক্লাসে কয়জন ছাত্র?

এখন তিরিশ জন। বর্ষার সময় কমে যায়, যাতায়াতের অসুবিধে, তাই।

কী রকম অসুবিধে?

পানি উঠে যায়। রাস্তাঘাট ডুবে যায়। অনেক ঘুরে বড় সড়ক দিয়ে যেতে হয়। কাদা-পানিতে হাঁটা খুব শক্ত।

ক্লাসের একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করল, তখন কি তোমরা বুট পরে যাও?

স্যার হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, ধুর বোকা। গ্রামের ছেলেদের বুট-ফুট লাগে না, তারা খালি পায়েই হেঁটে যেতে পারে।

স্যার ঠিকই বলেছেন, জুতা আমি বলতে গেলে কখনই পরি নি। এখন পরে আছি, কিন্তু সেটা তো স্কুলের পোশাক, সাদা শার্ট, নীল প্যান্ট আর কালো জুতা।

স্যার জিজ্ঞেস করলেন, গ্রাম থেকে হঠাৎ চলে এলি যে?

আমার ছোট খালার বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে এসেছি, স্যার।

ও। তাহলে তোর আব্বা-আম্মা কোথায় আছেন?

বাড়িতে।

ও। ও। স্যার মাথা নেড়ে চুপ করে গেলেন। একটু পরে বললেন, যা গিয়ে বস। নূতন নূতন তোর একটু অসুবিধে হতে পারে, আমাকে বলিস।

আমি পিছনের দিকে গিয়ে একটা খালি সিটে বসলাম, একজন একটু সরে আমাকে জায়গা করে দিল। আমাকে খুব ভালো করে লক্ষ করল ছেলেটা। ক্লাসে নূতন ছেলে এলে মনে হয় এভাবে লক্ষ করতে হয়।

ঘন্টা পড়ার পর স্যার চলে যেতেই দু'জন ছেলে আমার দিকে এগিয়ে এল। একজন ফর্সা মতো শুকনো, অন্যজন বেশ গাট্টাগোট্টা। ফর্সা মতন ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, বর্ষাকালে তুমি কি লুঙ্গি পরে স্কুলে যেতে?

ছেলেটা কেন এটা জিজ্ঞেস করছে বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করার ধরনটা বেশি ভালো না, কিন্তু তবু আমি উত্তর দিলাম। বললাম, হ্যাঁ। লুঙ্গি না পরে যাওয়া কঠিন। কখনো হাঁটু পানি, কখনো আরো বেশি—

ফর্সা ছেলেটা তার সঙ্গীর পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বলল, দ্যাখ—আমি বলেছি না?

গাট্টাগোট্টা সঙ্গীটি বলল, বাতাসে যখন তোমার লুঙ্গি উড়ে পাছা বের হয়ে যায় তখন তুমি কী কর?

আমি টের পেলাম, আমার মাথার ভিতরে আগুন ধরে গেছে। বাবা পাগল বলে সারা জীবন শুধু লোকজনের টিটকারি শুনে এসেছি, এটা আমার কাছে নূতন কিছু না।

টিটকারি কেমন করে শুনতে হয় আমার থেকে ভালো করে কেউ জানে না। টিটকারি শুনে কী করতে হয়, সেটাও আমার থেকে ভালো করে কেউ জানে না।

আমি খপ করে ছেলেটার শার্টের কলারটা ধরে বললাম, আমি তোমার মশকরার মানুষ না। আমার সাথে মশকরা কোরো না, দাঁত ভেঙে ফেলে দেব।

ছেলেটা আর যাই করুক, আমার কাছে এই রকম ব্যবহার আশা করে নি—একেবারে থতমত খেয়ে গেল। কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখন স্যার এসে গেলেন, কিছু বলতে পারল না। নিজের জায়গায় বসে একটু পরে পরে আমার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাতে লাগল। কে জানে ব্যাপারটি ভালো হল কি না—কিন্তু আমি দেখেছি ফিচলে বদমাইশগুলোকে এই ওষুধ দিয়ে খুব সহজে সিধে করে দেয়া যায়।

আমার পাশে যে বসেছিল, সে গলা নামিয়ে বলল, লিটন হচ্ছে জুনিয়ার ব্ল্যাক বেল্ট।

লিটন কে?

তুমি যার কলার ধরেছ।

সে কি?

ব্ল্যাক বেল্ট। নেপালে গিয়েছিল কম্পিটিশানে। সিলভার মেডেল পেয়েছিল।

স্যার হুঙ্কার দিলেন, কে কথা বলে রে?

পাশের ছেলেটি চুপ করে গেল, আমি তাই জানতে পারলাম না ব্ল্যাক বেল্ট মানে কি।

ব্ল্যাক বেল্ট মানে কি জানতে পারলাম টিফিনের ছুটিতে। স্যার বের হয়ে যেতেই গাট্টাগোট্টা লিটন আর ফর্সা মতন চশমা-পরা ছেলেটা আমার কাছে এগিয়ে এল। ক্লাসের বেশির ভাগ ছেলেরা কী ভাবে জানি বুঝে গেছে কী-একটা হবে, সবাই ক্লাসের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

লিটন আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, এরকম সময় তাই করার নিয়ম, তারপর বুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, তোকে আজ কিমা বানাব।

আমার একটুও ভয় লাগল না, জীবনে অনেক মারপিট করেছি, কাজেই জানি এটা এমন কিছু কঠিন জিনিস না। যারা মারপিট করে না, তারা মনে করে ব্যাপারটা সাঙ্ঘাতিক কিছু-একটা, খুব ভয় পায়। আমি লিটনের বুকের ধাক্কাটা ফেরত দিয়ে বললাম, আমাকে জ্বালিও না।

লিটন আবার আমার বুকে ধাক্কা দিল, এবারে আরেকটু জোরে, তারপর বলল, একেবারে কিমা বানিয়ে দেব।

মনে হচ্ছে সত্যি মারপিট করতে চায়, অনেক সময় এগুলো ভয় দেখানোর জন্যে করা হয়, কিন্তু মনে হচ্ছে এটা শুধু ভয় দেখানোর জন্যে নয়। মারপিট করার আগে অবস্থাটা একটু বুঝে দেখতে হয়, আমি আশেপাশে তাকালাম। ক্লাসের প্রায় সবাই মজা দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। মারপিট দেখার মতো মজার ব্যাপার কী হতে পারে? আমিও খুব শখ করে দেখি। শুরু হওয়ার পর কেউ কারো পক্ষ নেবে কি না সেটা হচ্ছে বড় কথা। মনে হয় নেবে না, সাধারণত নেয় না। চশমা-পরা ফর্সা ছেলেটা লিটনের পক্ষ নিতে পারে, কিন্তু দেখে মনে হয় না সে মারপিট করার মতো ছেলে,

==

একটা কৌৎকা খেলে সিধে হয়ে যাবে।

লিটন আবার বুকে ধাক্কা দিয়ে বলল, শালা।

আমি লিটনের বুকে ধাক্কাটা ফেরত দিয়ে বললাম, গালিগালাজ করবে না।

করলে কী করবি?

তুই তুই করে কথা বলবে না।

এক শ'বার বলব। তুই তুই তুই—

মারপিট করতে চাও?

কান ধরে দশবার ওঠবোস কর্, তা হলে ছেড়ে দেব।

তার মানে আসলেই মারপিট করতে চায়। নূতন স্কুলে নূতন ক্লাসে প্রথম দিনে এসেই মারপিট করাটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু সবই কপাল। আমি বললাম, আয় তাহলে।

লিটন একটু পিছনে সরে গিয়ে দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়াল, তারপর কেমন একটু বিচিত্রভাবে আস্তে আস্তে শরীরটাকে নাড়াতে শুরু করল। দেখে মনে হল মারপিট করার ব্যাপারটা খুব ভালো জানে, এই লাইনে নূতন আমদানি না। বলল, আয় শালার ব্যাটা।

আমি বললাম, তুই আয়।

লিটন বলল, সাহস থাকলে তুই আয়।

আমার সাহসের অভাব নেই, কিন্তু প্রথমে আমি তার গায়ে হাত তুলতে চাই না, সেটা ঠিক না। ব্যাপারটা যখন বড়দের সামনে যাবে, তখন কে শুরু করেছে সেটা নিয়ে খুব হৈ চৈ হবে। আমি বললাম, আয় দেখি তোর কত সাহস।

লিটনও এগিয়ে এল না, মারপিটের নিয়মকানুন সেও জানে। বলল, আয় দেখি শালার ব্যাটা। সাহস না থাকলে তোর বাপকে নিয়ে আয়।

আমাকে রাগানোর চেষ্টা করছে। আমাকে রাগানো এত সোজা নয়, কিন্তু বাবাকে টেনে কথা বললে ভিন্ন কথা। আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, চিৎকার করে বললাম, খবরদার, বাবাকে নিয়ে কথা বলবি না।

আমি লিটনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তারপর যেটা হল আমি সেটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। লিটন ম্যাজিকের মতো সরে গেল, শুধু তাই না, শূন্যে উঠে এক পাক ঘুরে গেল, তারপর কিছু বোঝার আগে পা ঘুরিয়ে আমার মুখের উপর প্রচণ্ড জোরে একটা লাথি মেরে বসল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম, মাথা ঘুরে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলাম, নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলাম, পারলাম না। একটা বেঞ্চের মাঝে মাথা ঠুকে গেল, তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে মেঝের উপর আছড়ে পড়লাম।

দাঁত দিয়ে জিব কেটে গেছে। মুখের রক্তের নোনা স্বাদ পাচ্ছি।

কোনোমতে উঠে দাঁড়াতেই লিটন আবার শূন্যে ঘুরে গিয়ে পা দিয়ে আমার মুখে লাথি মারার চেষ্টা করল, সতর্ক ছিলাম বলে কোনোমতে মাথাটা কাটালাম, কিন্তু লাথিটা এসে লাগল বুকে। আমি একেবারে কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে আছড়ে পড়লাম।

নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না, মনে হল বুঝি মরেই যাব। কিন্তু আমি মরলাম না—অপমান সহ্য করার জন্যে মানুষকে মনে হয় বেঁচে থাকতে হয়।

লিটন আমার উপর ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের উপর থুতু দিয়ে বলল, এবারে ছেড়ে

দিলাম। পরের বার জান শেষ করে দেব। জান না শালা তুমি কার সাথে লাগতে এসেছ?

আমি কোনোমতে ওঠার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। লিটন আমার সামনে দাঁড়িয়ে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, তোরা সাক্ষী। কে আগে শুরু করেছে?

কেউ কিছু বলল না।

কে শুরু করেছে?

তবু কেউ কোনো কথা বলল না। ফর্সা মতন চশমা-পরা ছেলেটা আমাকে দেখিয়ে বলল, এই বুদ্ধু।

লিটন একগাল হেসে বলল, হ্যাঁ, এই বুদ্ধু। যেরকম বুদ্ধি সেরকম শাস্তি।

তারপর অনেকটা সেনাপতির মতন ভাব করে ক্লাসঘর থেকে বের হয়ে গেল। সাথে আরো কয়েকজন।

ক্লাসে আমার পাশে যে ছেলেটি বসেছিল, সে আমাকে টেনে তুলে বলল, তোমাকে বলেছিলাম না লিটন ব্ল্যাক বেল্ট। এখন বুঝেছ?

আমি খানিকটা বুঝতে পারলাম। বইপত্রে জুজুৎসুর যে গল্প পড়েছি, সেরকম কিছু-একটা। গল্প পড়েছিলাম, সত্যি যে হতে পারে সেটা কখনো চিন্তা করি নি।

ছেলেটা বলল, তোমার কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে।

আমি কিছু বললাম না, ছেলেটা আবার বলল, লিটন আমাদের ফার্স্ট বয়। তোমার কত বড় সাহস যে লিটনের সাথে মারপিট করতে গেছ?

ফার্স্ট বয়? আমি অবাক হলাম। এরকম আগে কখনো দেখি নি, গুণ্ডাধরনের ছেলেদের সাধারণত পাস করা নিয়েই সমস্যা হয়।

হ্যাঁ। তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।

আমার মাথাটা তখনো হালকা হালকা লাগছে। কপালে দুঃখ আছে কি নেই সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো অবস্থা নেই। মেঝেতে রক্ত-মেশানো খানিকটা থুতু ফেলে বললাম, তোমরা সবাই লিটনের মতো?

ছেলেটা আমার দিকে অপরাধীর মতো তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, না, আমরা সবাই লিটনের মতো না। কেন?

না, এমনি জানতে চাইলাম।

লিটন হচ্ছে ডেঞ্জামাইস।

কি?

ডেঞ্জামাইস। ডেঞ্জারাস এবং বদমাইশ। লিটনকে একদিন টাইট করবে ব্ল্যাক মার্ডার দল।

কে?

ব্ল্যাক মার্ডার। আমাদের একটা টপ সিক্রেট দল। ভেরি টপ সিক্রেট। এই জন্যে তোমাকে বলা যাবে না।

ও। আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সাবধানে দু'এক পা হাঁটলাম। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুতে হবে, মুখে লিটনের থুতু। গা ঘিনঘিন করছে।

ব্ল্যাক মার্ডারের সদস্য ছেলেটি আমার সাথে হাঁটতে থাকে, আমাকে বাথরুমটি

==

দেখিয়ে দেবে। ছেলেটির মনটি বড় নরম, ব্ল্যাক মার্ডারের মতো একটা দলের সদস্য কেমন করে হল কে জানে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

আমার নাম? তারিকুল ইসলাম। তারিক ডাকে সবাই।

ক্লাসের প্রথম ছেলেটির সাথে আমার বন্ধুত্ব শুরু হল।

ক্লাসের ঘন্টা পড়ে গেছে। আমি আমার নিজের জায়গায় বসেছি। মুখটা খারাপভাবে ফুলে গেছে, ভিতরে কোথায় জানি কেটে গেছে। প্রচণ্ড ব্যথা করছে, কিন্তু সে জন্যে আমার যন্ত্রণা হচ্ছে না। আমার যন্ত্রণা হচ্ছে বুকের ভিতরে। রাগে দুঃখে অপমানে ভিতরটা একেবারে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে আমার। তারিক আমাকে একনজর দেখে বলল, তোমার কপালে দুঃখ আছে আজকে।

এই নিয়ে কথাটি সে মনে হয় দুই শ' বার বলে ফেলেছে! আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

তারিক আবার বলল, এখন ভূগোল ক্লাস। ভূগোল স্যারের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র হচ্ছে লিটন।

আমি কিছু বললাম না। তারিক আবার বলল, ভূগোল স্যারের সবচেয়ে প্রিয় খেলা কারাটে।

আমি তখনো কিছু বললাম না। তারিক ফিসফিস করে বলল, ভূগোল স্যার যখন আসবে তখন লিটন স্যারকে বলবে যে তুমি তার সাথে মারপিট করতে গেছ। স্যার তখন রেগে আগুন হয়ে যাবে। ভূগোল স্যার একবার রাগলে একেবারে সর্বনাশ।

আমি তখনো কিছু বললাম না। তারিক বলল, লিটন হচ্ছে ভূগোল স্যারের দিলের টুকরা। স্যার তখন তোমাকে হেড স্যারের কাছে পাঠাবেন। তারপর তোমার বাসায় চিঠি যাবে। তোমার এখন ডেঞ্জুপদ। ডেঞ্জারাস বিপদ। বাসায় এখন চিঠি যাবে—

আমি বললাম, গেলে যাবে। আমি সব ছেড়েছুড়ে বাড়ি চলে যাব। থাকব না এখানে।

আমার চোখে পানি এসে গেল হঠাৎ। তারিককে না দেখিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করলাম, তারিক তবু দেখে ফেলল। জিব দিয়ে চুকচুক করে শব্দ করে আস্তে আস্তে বলল, কী ডেঞ্জুপদ! তোমার কপালে অনেক দুঃখ আজ।

কিন্তু দেখা গেল সেদিন আমার কপালে আর নূতন কোনো দুঃখ ছিল না। ভূগোল স্যার আসেন নি বলে ক্লাস নিতে এলেন আমাদের সকালের ক্লাস টিচার। ক্লাসে ঢুকে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললেন, পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত তাহলে কী হত, বল্ দেখি?

লিটন বলল, কেমন করে হবে, স্যার? মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্য—

স্যার লিটনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, পৃথিবীটা গোল, সে জন্যে আমরা পড়ি ভূগোল। পৃথিবীটা যদি চ্যাপ্টা হত তাহলে আমরা পড়তাম ভূ–চ্যাপ্টা।

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল আর ঠিক তখন স্যার আমাকে দেখতে পেলেন। সাথে সাথে স্যার উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লম্বা পা ফেলে আমার কাছে হেঁটে এলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে তোর? কী হয়েছে?

আমি লজ্জায় মাথা নিচু করলাম।

স্যার শক্ত হাতে আমার মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখলেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, তারপর ক্লাসের দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় বললেন, একে কে মেরেছে এভাবে?

কেউ কোনো কথা বলল না। স্যার হঠাৎ এত জোরে চিৎকার করে উঠলেন যে মনে হল ক্লাসের ছাদ বুঝি ভেঙে উড়ে যাবে, কে মেরেছে?

পুরো ক্লাস কেঁপে উঠল। লিটন ফ্যাকাসে মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে মারতে এসেছিল, স্যার। আপনি জিজ্ঞেস করে দেখেন—

স্যার লিটনের কোনো কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না। পায়ে পায়ে লিটনের দিকে এগিয়ে গেলেন, চুলের মুঠি ধরে মুখটা ঘুরিয়ে নিলেন নিজের দিকে, তারপর স্থির চোখে তাকালেন তার দিকে।

লিটন কেমন জানি কুঁকড়ে গেল সেই ভয়ংকর দৃষ্টির সামনে, চোখ সরানোর সাহস নেই, ভয়ংকর আতঙ্কে সে তাকিয়ে রইল স্যারের দিকে।

ক্লাসে কোনো পড়াশোনা হল না। স্যার একটি কথা না বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। ক্লাসের ছেলেরা একটা টুঁ শব্দ করার সাহস পেল না, চুপচাপ নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল নিজের জায়গায়।

ঘন্টা পড়ার পর বের হয়ে যেতে যেতে থেমে গিয়ে স্যার বললেন, বড় দুঃখ পেলাম রে আমি আজ। নূতন একটা ছেলে তোদের ক্লাসে প্রথম দিনেই এত কষ্ট পেল, তোরা কেউ কিছু করলি না।

আমার চোখে পানি এসে গেল হঠাৎ। এরকম একজন মানুষ যদি থাকে তাহলে আমার দুঃখ কি? ছেড়েছুড়ে যাব না আমি, থাকব এখানে। লিটনের মতো দানব আছে সত্যি, কিন্তু তারিকের মতো বন্ধুও তো আছে, স্যারের মতো মানুষও তো আছে, যার হৃদয়টা ঠিক আমার বাবার মতো।

৪. চিঠি

সেদিন বাসায় এসে দেখি আমার তিনটি চিঠি এসেছে। একটিতে টিকিট লাগানো নেই, তাই বেয়ারিং। সেটা বাবা লিখেছেন। অন্য দু'টির একটি লিখেছে মা আর একটি রাঙাবুবু। আরেকটা লিখেছে আমার প্রাণের বন্ধু দুলাল। বেয়ারিং চিঠিটা পয়সা দিয়ে নিতে হয়েছে, আমার খুব লজ্জা লাগল ছোট খালার সামনে। অন্যের চিঠি নাকি খুলতে হয় না, কিন্তু ছোট খালা সবগুলো চিঠি খুলে রেখেছেন। আমার হাতে দিয়ে বললেন, আমার চিঠি আছে কি না দেখার জন্যে খুলেছিলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আছে, ছোট খালা?

হ্যাঁ। বুবু লিখেছে একটা। তোকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করছে। ভালো করে একটা চিঠি লিখে দিস।

দেব, ছোট খালা।

তারপর আমি চিঠিগুলো নিয়ে পড়তে বসেছি। প্রথমে পড়লাম মায়ের চিঠি, পড়তে

পড়তে চোখে পানি এসে গেল একেবারে। নানারকম উপদেশ আছে চিঠিতে, ছোট খালা আর খালুর কথা যেন শুনি, বল্টু আর মিলির সাথে যেন ঝগড়া না করি, মন দিয়ে যেন পড়াশোনা করি, শরীরের যেন যত্ন করি, জুম্মার নামাজ কখনো যেন ক্বাজা না করি, রাস্তাঘাটে যেন খুব সাবধানে বের হই, একা একা যেন কোথাও না যাই—এইরকম অনেক কথা।

মায়ের চিঠি শেষ করে রাঙাবুবুর চিঠি পড়লাম। আগে ভেবেছিলাম রাঙাবুবু শুধু সুন্দর করে গল্প বলতে পারে, এখন দেখলাম খুব সুন্দর চিঠিও লিখতে পারে। কী সুন্দর করে চিঠিটাই না লিখেছে। বাড়ির সব খবর দিয়েছে চিঠিতে, লাল গাইটা আমাকে কেমন করে খোঁজ করে, রাতে শেয়াল এসে কেমন করে মোরগ নিয়ে গেছে, বাবা কেমন উল্টাপাল্টা বাজার করে আনছেন, বড়বুবুর ছোট বাচ্চাটি কি রকম দুষ্টু, এইরকম সব মজার মজার খবর। রাঙাবুবুও আবার বড় বোনের মতো উপদেশ দিয়েছে, তারপর লিখেছে আমি যেন কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা না করি, কারণ দেখতে দেখতে রোজার ছুটি এসে যাবে, আর তখন আমি বাড়ি চলে আসতে পারব।

রাঙাবুবুর চিঠি শেষ করে আমি পড়লাম দুলালের চিঠি। দুলাল আর আমি একজন আরেকজনকে তুই তুই করে বলি, কিন্তু সে চিঠি লিখেছে তুমি তুমি করে। সারা চিঠিতে অনেকগুলো বানান ভুল। 'ড়' বলে যে একটা অক্ষর আছে মনে হয় সে জানেই না, 'বাড়ি'কে লিখেছে 'বারি', 'পড়া'কে লিখেছে 'পরা'। বানান ভুল থাকুক আর যাই থাকুক, চিঠিটার মাঝে অনেক খবর আছে। আমি নেই বলে গোল্লাছুট খেলা আর জমছে না, এই বছর ফুটবল টিম বেশি সুবিধে করতে পারছে না, মেম্বার সাহেবের ছোট ছেলে যাত্রাদলের একটা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে মেম্বার সাহেব তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছেন, বাজারের কাছে সে একটা ঘর ভাড়া করে আছে, মাছ-বাজারে আগুন লেগেছিল, বেশি ক্ষতি হওয়ার আগেই আগুন নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, নীল গাঙে নাকি একটা মাছ ধরা পড়েছে, সেটার অর্ধেক মানুষ অর্ধেক মাছ, জেলের সাথে কথা বলেছে, তখন জেলে তাকে ছেড়ে দিয়েছে, উল্লাপুরের পীর সাহেব এক টাকার নোটকে দশ টাকার নোট বানিয়ে দিচ্ছেন, খানসাহেবের ছোট ছেলে খৎনা করার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছে ইত্যাদি। চিঠির শেষে লিখেছে, গাড়ি চড়ার লোভে তাকে ছেড়ে চলে আসাটা একেবারেই ভালো কাজ হয় নাই। জীবন অল্পদিনের—প্রাণের বন্ধুর মনে আঘাত দেওয়া ভালো কাজ নয়, আল্লাহ্ নারাজ হতে পারেন।

সবার শেষে বাবার চিঠিটা হাতে নিলাম। বেশি বড় চিঠি নয়, রুল-টানা কাগজের দুই পৃষ্ঠায় লেখা। বাবার হাতের লেখা বেশ ভালো, তবে বেশি লেখেন না। বাবাও আমাকে তুই-তুই করে বলেন, কিন্তু লিখেছেন তুমি করে। বাবা লিখেছেন ঃ

বাবা বিলু ঃ

পর সমাচার এই যে, তুমি চলিয়া যাইবার পর লাল গাইটি অত্যন্ত মন-খারাপ করিয়াছে। গতকল্য সে আমার সহিত দীর্ঘ সময় কথা বলিয়াছে। সে এবং তাহার বাছুর দুইজনেই মনে করে তোমার অবিলম্বে ফিরিয়া আসা উচিত। পশুপাখি সাধারণত সত্য কথা বলিয়া থাকে, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিবা।

বাড়ির পিছনে যে জঙ্গল রহিয়াছে, সেইখানে যে বড় গাবগাছটি রহিয়াছে, সেইটি

আমাকে বড়ই বিরক্ত করিতেছে। গাবগাছটির ধারণা, তাহার উপর একটি দুষ্ট প্রকৃতির ভূত রাত্রিনিবাস করিয়া থাকে। আমি তাহাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করিয়াছি যে পৃথিবীতে ভূত বলিয়া কিছু নাই, সব তাহার মনের ভুল। তুমি আসিয়া তাহাকে একবার বুঝাইলে সম্ভবত সে বিশ্বাস করিবে। বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস যে ভূত নিয়া গবেষণা করিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন, সেইটি অবশ্যি অবশ্যি তাহাকে বুঝাইয়া দিও।

তোমার মাতা তোমার খবরের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন বলিয়া আমি মাছ–বাজারের বড় দাঁড়কাকটিকে তোমার ছোট খালার বাসায় পাঠাইয়াছিলাম। প্রথমে সে এত দূরে উড়িয়া যাইতে রাজি হয় নাই, রাজি করাইবার জন্য তাহাকে একটা কুকী বিস্কুট কিনিয়া দিতে হইয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছে যে তুমি ভালোই আছ, কিন্তু বাড়িতে ফিরিয়া আসিবার জন্য তোমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে। মাঝে মাঝে খবরের জন্য আমি তাহাকে তোমার কাছে পাঠাইব। তুমি দেখিলেই চিনিতে পারিবে, সে একটু গম্ভীর প্রকৃতির এবং ডান পা'টি একটু টানিয়া টানিয়া হাঁটে। তাহার চক্ষু লাল রঙের। তাহাকে দেখিলে তুমি একটি কুকী বিস্কুট কিনিয়া দিও, সে কুকী বিস্কুট খাইতে খুব পছন্দ করে।

তোমার পিতা
ফজলুল করিম।

চিঠিগুলো পড়ে ভাঁজ করে পকেটে রেখে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম, মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। দূরে অনেকগুলো কাক ঝগড়া করছে, কে জানে এর মাঝে বাবার সেই লাল চোখের দাঁড়কাকটি আছে কি না।

এরকম সময়ে বল্টু এসে বলল, আম্মা বলেছে তোমার বাবার চিঠিটা দিতে।

কেন?

জানি না। মনে হয় আব্বাকে দেখাবে।

আমি বললাম, চিঠিটা নাই।

কেন? কী হয়েছে?

ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

ছিঁড়ে ফেলেছ?

হ্যাঁ।

কেন?

আমি পকেটে হাত দিয়ে বাবার চিঠিটা ছুঁয়ে সরল মুখে বললাম, আমি সবসময় চিঠি পড়া শেষ হলে ছিঁড়ে ফেলি। রেখে কী হবে?

বল্টু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল। আমি তখন বাবার চিঠিটা বের করে আবার পড়তে শুরু করলাম।

==

৫. ম্যাগনিফাইং গ্লাস

স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি খালুর ছোট ভাই আমেরিকা থেকে বেড়াতে এসেছেন। আমি তাঁকে আগে কখনো দেখি নি, মায়ের কাছে গল্প শুনেছিলাম। গায়ের রং ছোট খালুর মতো এত কালো নয়, বেশ ফর্সা। কথা বলেন একটু জড়িয়ে জড়িয়ে, বাংলা বললেও মনে হয় ইংরেজি বলছেন।

স্যুটকেস খুলে তিনি দুইটা খেলনা বের করে একটা দিলেন বল্টুকে, আরেকটা মিলিকে, তারপর হঠাৎ সাথে আমাকে দেখে থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, এটা কে?

বল্টু বলল, আমার খালাতো ভাই। গ্রাম থেকে এসেছে। এর বাবা পাগল।

ছোট খালু বল্টুকে একটা রাম-ধমক দিলেন।

খালুর ভাই একবার ছোট খালার দিকে তাকালেন, আরেকবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর আবার ছোটা খালার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাবী, আমি তো জানতাম না, আর কেউ আছে এখানে, তাই শুধু দুইটা খেলনা এনেছি। এখন—

বল্টু ততক্ষণে তার খেলনাটা খুলে ফেলেছে, একটা মেকানো সেট। কী চমৎকার খেলনা, এটা জুড়ে দিয়ে কত রকম জিনিস তৈরি করা যায়। বল্টু ''মেকানো সেট—আমার মেকানো সেট'' বলে চিৎকার করে খুশিতে লাফাতে লাগল। মিলিও তার খেলনাটা বের করল, কী সুন্দর একটা পুতুল একটা ট্রাই সাইকেলে বসে আছে। পিছনে সুইচটা টিপতেই সেটি বাজনা বাজিয়ে ঘুরতে শুরু করে। ইস, কী সুন্দর!

ছোট খালু বললেন, বল্টু, তোর তো অনেক খেলনা আছে, এইটা বিলুকে দিয়ে দে, আরেক বার—

না না না না না—বলে বল্টু ঠোঁট উল্টিয়ে মুখ বাঁকা করে চিৎকার করে লাফিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, আমার কিছু লাগবে না, কিছু লাগবে না—

ছোট খালুর ভাই তার স্যুটকেস খুলে এদিক-সেদিক হাতড়ে একটা কলম, একটা রংচঙে নোটবই, আরেকটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে বললেন, তুমি এগুলোর কোনো একটা নিতে চাও?

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটার জন্যে আমার খুব লোভ হচ্ছিল, কিন্তু আমি তবু জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বললাম, আমার কিছু লাগবে না।

নাও, যেটা পছন্দ সেটা নাও।

আমি সাবধানে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নিলাম। হাতের উপর রেখে হাতটা দেখতেই মনে হল একটা দৈত্যের হাত।

ছোট খালুর ভাই হেসে বললেন, এটা দিয়ে শুধু একটা জিনিসে সাবধান, কখনো সূর্যের দিকে তাকাবে না।

আমি মাথা নাড়লাম।

আমার মনে হল ম্যাগনিফাইং গ্লাস থেকে মজার কোনো জিনিস পৃথিবীতে থাকতে পারে না। একটা পিঁপড়াকে দেখলাম ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে, সেটাকে দেখাল একটা ট্রেনের ইঞ্জিনের মতো, দেয়াল থেকে একটা মাকড়সা ধরে এনে দেখলাম, সেটাকে

দেখাল একটা অক্টোপাসের মতো—আমি কখনো অক্টোপাস দেখি নি, কিন্তু দেখতে নিশ্চয়ই এরকম হবে। একটা গাছের পাতাকে ছিঁড়ে দেখলাম, সেটাকে মনে হল বিছানার চাদর। আমি আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস নিয়ে ঘুরে বেড়ালাম সারাদিন। যেটাই পাই সেটাই দেখি। বাবার চিঠিটাও দেখলাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। লাইনগুলোকে মনে হল পীচঢালা রাস্তা।

দু'দিন পর আরো একটা মজার জিনিস আবিষ্কার করলাম, বইয়ে পড়েছিলাম, সত্যি হতে পারে কখনো চিন্তা করি নি। সূর্যের আলোতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরলে রোদটা এক বিন্দুতে একত্র হয়ে আবার ছড়িয়ে পড়ে। যে-বিন্দুতে সেটা একত্র হয়, সেই বিন্দুটা অসম্ভব গরম। এত গরম যে সেখানে হাত রাখলে হাত রীতিমতো পুড়ে যায়। শুধু তাই নয়, একটা শুকনো কাগজে এই বিন্দুটাতে ঠিকভাবে ধরে রাখতে পারলে সেখানে আগুন পর্যন্ত ধরে যায়। আমি যখন ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম, ঠিক তখন একটা পিঁপড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল সেটার উপর, সেই বিন্দুটা ধরতেই ফট করে শব্দ করে পিঁপড়াটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

একটা পিঁপড়াকে খামোকা মেরে ফেললাম, বাবা দেখলে কত রাগ করতেন! কতবার পিঁপড়াটার কাছে আমার হয়ে মাফ চাইতেন।

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা আমার সবসময়ের সঙ্গী হয়ে গেল। সবসময় আমার স্কুলের ব্যাগে রাখি, সময় পেলেই সেটা দিয়ে আশেপাশে যা কিছু আছে সেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। যে-জিনিসটা এমনিতে দেখতে খুব সাধারণ, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখলে সেটাকেই কী বিচিত্র, কী অসাধারণ মনে হয়। যে-মানুষ প্রথম এটা আবিষ্কার করেছিল তার নিশ্চয়ই কত আনন্দ হয়েছিল।

আমি তখনো জানতাম না যে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি ঘটবে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি দিয়ে।

৬. অবাক পোকা

সেদিন আমাদের স্কুল ছুটি। ছোট খালা বল্টু আর মিলিকে নিয়ে বল্টুর এক বন্ধুর জন্মদিনে বেড়াতে গিয়েছেন। আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এসব জায়গায় আজকাল আর আমার যাওয়ার ইচ্ছা করে না। কাউকে চিনি না, কিছু না, যাওয়ার পর বল্টু প্রথমেই সবাইকে ডেকে বলবে, এই যে এ হচ্ছে বিলু। এর বাবা পাগল, তাই গ্রাম থেকে আমাদের বাসায় থেকে পড়াশোনা করতে এসেছে।

তখন সবসময়েই কেউ-না-কেউ জানতে চায় আমার বাবা কেমন করে পাগল হলেন, কী রকম পাগলামি করেন, বেঁধে রাখতে হয় কি না, এইসব। আমার খুব খারাপ লাগে। আমি যেতে চাই না শুনে ছোট খালা বেশি জোর করলেন না, বল্টু আর মিলিকে নিয়ে চলে গেলেন। ছোট খালু সকালেই কী-একটা কাজে বের হয়ে গেছেন, তাই বাসায় থাকলাম আমি একা আর বাসার কাজের ছেলেটা।

আমি প্রথমে টেলিভিশনটা চালিয়ে দেখলাম, সেখানে কিছু নেই, তাই রেডিওটা

চালিয়ে দেখলাম সেখানে যন্ত্রসংগীত হচ্ছে, আমার যন্ত্রসংগীত একেবারেই ভালো লাগে না, তাই রেডিওটা বন্ধ করে দিচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক তখন খবর শুরু হল। প্রথমে মধ্যপ্রাচ্যে কী রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ হচ্ছে সেটা বলে খুব একটা আশ্চর্য খবর বলল। গত কয়েক দিন থেকে নাকি পৃথিবীর সব মানমন্দিরে আশ্চর্য এবং রহস্যময় কিছু সংকেত ধরা পড়ছে। সংকেতগুলো থেকে মনে হয় রহস্যময় কোনো-এক মহাকাশযান পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছে। রাডার বা মহাকাশের টেলিস্কোপ দিয়ে সেটাকে দেখার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু দেখা সম্ভব হয় নি। দু দিন আগে সেই রহস্যময় সংকেত হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, সেই মহাকাশযানে পৃথিবীর কোনো নির্জন এলাকায় নেমেছে কিংবা নামার চেষ্টা করে ধ্বংস হয়ে গেছে।

খবরটা সত্যি বলছে নাকি ঠাট্টা করে বলছে, বুঝতে পারলাম না। খবরে তো আজগুবি জিনিস বলার কথা নয়। আজকাল অবশ্যি কিছুই বলা যায় না, সেদিন একটা পত্রিকায় দেখেছি কে নাকি চোখের দৃষ্টি দিয়ে আকাশের মেঘকে দুই ভাগ করে ফেলে। আরেক জায়গায় দেখেছি কে নাকি যোগ সাধনা করে বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। কে জানে এটাও হয়তো সেরকম কিছু হবে।

আমি রেডিওটা বন্ধ করে আমার ঘরে গেলাম। স্টোররুমের জিনিসপত্র সরিয়ে সেখানে আমার জন্যে একটা বিছানা পেতে দেওয়া হয়েছে। ঘরটা ভালোই, একটা ছোট জানালা দিয়ে খানিকটা আকাশ দেখা যায়। আমি এখানে রাতে ঘুমাই, কিন্তু পড়তে বসি ঝুমু আর মিশির সাথে এক টেবিলে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রথমে আমি মা'কে একটা চিঠি লিখলাম। বাবাকেও একটা লিখব ভেবে অনেকক্ষণ কাগজ-কলম নিয়ে বসে রইলাম, কিন্তু কী লিখব ঠিক বুঝতে পারলাম না। তার পাঠানো দাঁড়কাকটা এসেছিল, একটা কুকীর বিস্কুট খেতে দিয়েছি, আমার সাথে অনেকক্ষণ গল্প করেছে—এসব তো আর চিঠিতে লিখতে পারি না। বাবার কথা মনে পড়ে খানিকক্ষণ আমার মন খারাপ হয়ে থাকল, তখন ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাতে নিয়ে আমি ছাদে উঠে গেলাম। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের আরো একটা জিনিস এতদিনে আবিষ্কার করেছি, চোখ থেকে একটু দূরে ধরে রেখে আরো দূরের কোনো জিনিসের দিকে তাকালে সেটাকে সব সময় উল্টো দেখায়। ছাদে বসে রাস্তাঘাট বাড়িঘর সব মানুষকে উল্টো করে দেখতে বেশ মজাই লাগে আমার।

অনেকক্ষণ ছাদে বসে কাটালাম আমি। ছাদের রেলিং দিয়ে একটা পিঁপড়ার সারি চলে গেছে, খুব ব্যস্ত হয়ে কোথায় জানি যাচ্ছে সবগুলো পিঁপড়া। কে জানে পিঁপড়ার কোনো আত্মা আছে কি না—বাবাকে জিজ্ঞেস করলে সবসময় বলবেন, আছে। কিন্তু আসলেই কি আছে? আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে রোদটাকে এক বিন্দুতে একত্র করে গোটা দশেক পিঁপড়াকে পুড়িয়ে মেরে ফেললাম, সাথে সাথে পুরো সারিটা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আবার কিছু মারব কি না ভাবছিলাম, তখন বাবার কথা মনে পড়ল। বাবা দেখলে খুব রাগ করতেন, মশা পর্যন্ত মারেন না বাবা। ধরে ধরে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে মশারির বাইরে ছেড়ে দেন।

বাকিগুলো আর কোনো পিঁপড়াকে না মেরে আমি দেখতে শুরু করলাম সারিটা কোথায় যাচ্ছে, রেলিং বেয়ে একবার নিচে নেমে আবার উপরে উঠে এল, একটা ফুটো দিয়ে একদিক দিয়ে ঢুকে অন্যদিক দিয়ে বের হয়ে আবার রেলিঙের উপরে উঠে এল।

পিঁপড়াগুলো সারি বেঁধে এসে এক জায়গায় গোল হয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে আছে। বৃত্তের ঠিক মাঝখানে ছোট কালো মতন একটা পোকা, সেটা পিঁপড়া থেকেও ছোট। পিঁপড়াকে আমি আগেও মরা ঘাস–ফড়িং বা তেলাপোকা টেনে টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি, কিন্তু এত ছোট পোকাকে এভাবে ঘিরে থাকতে দেখি নি। পোকাটাকে ধরতে যাচ্ছে না কেন বুঝতে পারলাম না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে মাঝখানের ছোট পোকাটা খুজলির মলম বিক্রি করার চেষ্টা করছে আর সবগুলো পিঁপড়া গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম, খুবই ছোট পোকা, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়েও সেটাকে খুব ভালো দেখা গেল না। ভালো করে দেখে মনে হল এটা ঠিক পোকা নয়, ছোট গাড়ি কিংবা ট্যাঙ্ক কিংবা প্লেন। কিংবা যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরি কোনো–একটা জিনিস। আমি আগেও লক্ষ করেছি, খুব সাধারণ জিনিসকেও ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে খুব বিচিত্র দেখায়। আমি আরো ভালো করে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম, আর তখন হঠাৎ মনে হল সেটার একটা দরজা খুলে গেল, আর ভিতর থেকে আরো ছোট একটা কিছু বের হয়ে এল। সেটি এদিক–সেদিক তাকিয়ে একটা শুঁড় উপরে তুলে কী করল, আর সাথে সাথে একটা পিঁপড়া এগিয়ে এল তার দিকে। পরিষ্কার মনে হল কিছু কথাবার্তা হল পিঁপড়াটার সাথে, তারপর সেই ছোট জিনিসটা ভিতরে ঢুকে গেল, তার আর কোনো চিহ্ন নাই।

আমি হাঁটু গেড়ে বসে আরো ভালো করে পোকাটা দেখার চেষ্টা করলাম। যতই দেখি জিনিসটাকে ততই যন্ত্রপাতির মতো মনে হয়। অত্যন্ত ছোট কিন্তু অত্যন্ত জটিল একটা যন্ত্র। মনে হচ্ছে উপর থেকে কিছু তামার নল বের হয়ে এসেছে, নিচে দিয়ে মনে হল একটু লাল রঙের আলো বের হচ্ছে। পিছন দিয়ে স্প্রিঙের মতো ধাতব একটা জিনিস। কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে দেখব কি না ভাবছিলাম, তখন হঠাৎ মনে হল যে এটাকে আমার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কড়া একটা ছ্যাঁকা দিয়ে দেখি।

আমি ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা ধরে সূর্যের আলোকে একবিন্দুতে একত্র করে ছোট পোকাটার মাঝে আগুন ধরানোর চেষ্টা করলাম, আর কী আশ্চর্য, হঠাৎ মনে হল জিনিসটা থেকে একঝলক নীল আলো বের হয়ে এল, পিঁপড়াগুলো হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। আমি আবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম, মনে হল আবার ছোট একটা দরজা খুলে গেল, আর ভিতর থেকে আরো ছোট কী–একটা বের হয়ে শুঁড় উঁচু করে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ ঝিঁঝি পোকার ডাকের মতো শব্দ শুনতে পেলাম, তার মাঝে পরিষ্কার গলায় কে জানি বলল, না–না—গরম দিও না।

আমি ভীষণ চমকে আশেপাশে তাকালাম। কে বলল কথাটা? কেউ তো নেই ছাদে। আবার আমি তাকালাম ভালো করে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিয়ে। ছোট পোকাটি, যেটি শুঁড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, সেটাকে মনে হল খুব ছোট একটা মানুষের মতো। মনে হল তার বড় একটা মাথা, এমন কি দু'টি চোখও আছে। যেটাকে শুঁড় ভাবছি সেটা শুঁড় হতে পারে, হাতও হতে পারে। আমি আরো ভালো করে দেখার জন্যে কাছে এগিয়ে যেতেই জিনিসটা আবার নড়ে উঠল, ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তার মাঝে আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম, না, না, কাছে এসো না।

==

আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বাবার মতো আমিও কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? পোকামাকড়ের কথা শুনতে পাচ্ছি? কী সর্বনাশ।

খানিকক্ষণ আমি ছাদে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। বিচিত্র পোকাটাকে একটা রাম–থাবড়া দিয়ে চ্যাপ্টা করে ফেলব কি না ভাবলাম একবার। কিন্তু করলাম না, নিচে থেকে একটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশি নিয়ে এলাম। পোকাটাকে ঘিরে পিঁপড়াগুলো এখনো গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে মনে হল তাদের মাঝে উত্তেজনা অনেক বেড়েছে। আমি একটা কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে জিনিসটাকে শিশির ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করলাম। ব্যাপারটা সোজা নয়, মনে হল সেটা থেকে কিছু আগুনের ফুলকি বের হয়ে এল। আর তার থেকেও বিচিত্র ব্যাপার, কে জানি বলল, ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও আমাকে।

আমি ছেড়ে দিলাম না, সেই বিচিত্র পোকাটিকে হোমিওপ্যাথিক শিশির মাঝে ভরে ফেললাম।

পোকাটির কথা কাউকে বলার ইচ্ছা করছিল। প্রথমে বল্টুকে বলার চেষ্টা করলাম, বললাম, ছাদে একটা পোকা দেখেছি আমি। দেখলে অবাক হয়ে যাবে।

কেন?

পোকাটা কথা বলে—বলতে গিয়ে থেমে গেলাম আমি, বাবার কথা মনে পড়ল হঠাৎ।

বললাম, নিচে দিয়ে আগুন বের হয়।

ও। ওটার নাম জোনাকি পোকা।

না, জোনাকি পোকা না, জোনাকি পোকা আমি চিনি। জোনাকি পোকা থেকে অনেক ছোট।

জোনাকি পোকার বাচ্চা।

কাছে মিলি দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, ইয়াক থুঃ, পোকা। ছিঃ ছিঃ।

কাজেই আলাপ বেশি দূর এগুতে পারল না। দুলাল থাকলে হত। বিচিত্র ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ। দুই মাথাওয়ালা বাছুর হয়েছে শুনলে স্কুল ফাঁকি দিয়ে সে দশ মাইল হেঁটে দেখতে যায়। বাবা থাকলেও হত, পোকামাকড়ের কথা এমনিতেই শুনতে পান, এটার কথা নিশ্চয়ই আরো ভালো করে শুনতেন।

রাতে ঘুমানোর সময় অবশ্যি আমি মোটামুটি পোকাটার কথা ভুলে গেলাম। একটা পোকা কথা বলছে, সেটা তো হতে পারে না। আসলে ঠিক তখন নিশ্চয়ই নিচে রাস্তায় অন্য কোনো মানুষ কারো সাথে কথা বলেছে, আর আমার মনে হয়েছে আমার সাথে কথা বলেছে। বাতি নেভানোর জন্যে যখন উঠেছি, জানালার কাছে দাঁড়িয়ে নিচে তাকালাম, রাস্তায় বাসার সামনে দুটি মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। এত রাতে এখানে মাইক্রোবাস করে কে এসেছে কে জানে!

৭. মহাকাশের প্রাণী

ক্লাসে ঢুকেই স্যার পকেট থেকে একটা খবরের কাগজ বের করে বললেন, কে কে আজ খবরের কাগজ পড়েছে?

দেখা গেল কেউ পড়ে নি। লিটন বলল, কাগজে শুধু রাজনীতির খবর থাকে, স্যার, তাই পড়তে ইচ্ছা করে না।

স্যার বললেন, যে–খবরই থাকুক, খবরের কাগজ পড়তে হয়। স্যার জোরে জোরে পড়লেন, মহাকাশের আগন্তুক।

আমি লাফিয়ে উঠে বললাম, রেডিওতে শুনেছি স্যার এটা আমি। এটা কি সত্যি?

স্যার মাথা নেড়ে বললেন, মনে তো হচ্ছে সত্যি।

অন্য সব ছেলেরা তখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছে, স্যার তাই পুরো খবরটা পড়ে শোনালেন। আমি রেডিওতে যেটা শুনেছি মোটামুটি সেই খবরটাই, তবে খুঁটিনাটি আরো কিছু বর্ণনা আছে। আমেরিকার এক মানমন্দিরের ডিরেক্টরের কথা আছে, অস্ট্রেলিয়ার একজন মহাকাশ–বিজ্ঞানীর কথা আছে। সবাই বলেছে যে তারা মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে সত্যি একটি রহস্যময় মহাকাশযান পৃথিবীকে ঘিরে ঘুরছিল। তার সাথে নাকি যোগাযোগও করা হয়েছিল। মহাকাশযানটি দেখার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, বেশ কয়েকটি কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে চেষ্টা করা হয়েছে, রাডার দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, পৃথিবীর সব টেলিস্কোপ দিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, মহাকাশযানটি পৃথিবীতে নামার চেষ্টা করেছিল, হয়তো ঠিকমতো নামতে পারে নি, হতে পারে কোনোভাবে বিধ্বস্ত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা যে–এলাকায় সেটা বিধ্বস্ত হয়েছে বলে মনে করছেন, তার মাঝে বাংলাদেশ, বার্মা, ভিয়েতনাম, প্রশান্ত মহাসাগর, ইন্দোনেশিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল রয়েছে। পুরো এলাকায় খুব খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। আশ্চর্যজনক কিছু দেখলে সাথে সাথে কর্তৃপক্ষকে জানানোর কথা বলা হয়েছে।

সারা ক্লাস খুব উত্তেজিত হয়ে গেল। স্যার পায়চারি করতে করতে বললেন, চিন্তা করতে পারিস, যদি সত্যি সত্যি অন্য একটা গ্রহ থেকে একটা প্রাণী এসে হাজির হয় তাহলে কী মজাটাই হবে? দেখতে কেমন হবে বলে মনে হয় তোদের?

লিটন বলল, আমি সেদিন একটা সিনেমা দেখেছিলাম, স্যার। সেখানে দেখিয়েছিল, দেখতে খুব ভয়ঙ্কর।

স্যার বললেন, সিনেমা তো গাঁজাখুরি, আসলে কেমন হবে?

আমি একটু ইতস্তত করে বললাম, আমি একটা বইয়ে পড়েছিলাম, বুদ্ধিমান প্রাণীরা দেখতে নাকি মানুষের মতনই হওয়ার কথা। বড় একটা মগজ থাকবে—তার কাছাকাছি থাকবে চোখ, দূরত্ব বোঝার জন্যে সবসময় হতে হবে দু'টো চোখ—

হাত?

আমি মাথা চুলকে বললাম, সেটা কিছু বলে নি। কিন্তু কিছু ধরার জন্য আঙুল না হয় শুঁড় থাকতে হবে।

স্যার মাথা নাড়লেন, ঠিকই বলেছিস। কোন গ্রহ থেকে আসছে তার উপরেও অনেক কিছু নির্ভর করবে। সেই গ্রহ কত বড়, মাধ্যাকর্ষণ বল কত বেশি, বাতাস আছে কি নেই, থাকলে কি কি গ্যাস আছে, এইসব। কী মনে হয় তোদের? প্রাণীটা কি হাসিখুশি হবে, নাকি বদরাগী?

লিটন বলল, বদরাগী হবে, স্যার। মহাকাশের প্রাণী সবসময় খুব ডেঞ্জারাস হয়। সবকিছু ধ্বংস করে ফেলে। টিভিতে একটা সিনেমা দেখিয়েছিল—

স্যার বললেন, ধুর! সিনেমা সবসময় গাঁজাখুরি হয়। আমার মনে হয় প্রাণীটা হবে খুব মিশুক। কতদূর থেকে পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে ভেবে দেখ্। সে যদি মিশুক না হয় তাহলে কে মিশুক হবে?

পুরো ক্লাস স্যারের সাথে একমত হল। স্যার খানিকক্ষণ হেঁটে আবার বললেন, তারপর চিন্তা করে দেখ্, পৃথিবীটা কত সুন্দর, সেই মহাকাশের প্রাণী দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষের সাথে যখন তার পরিচয় হবে তখন মনে হয় সে পৃথিবী ছেড়ে যেতেই চাইবে না। কী বলিস তোরা?

আমরা সবাই জোরে জোরে মাথা নাড়লাম। স্যার বাচ্চা মানুষের মতো ছটফট করতে করতে বললেন, কিন্তু মহাকাশযানটাকে দেখা যাচ্ছে না কেন? বিজ্ঞানীরা সেটাকে দেখতে পেল না কেন?

লিটন বলল, আমি একটা বইয়ে পড়েছি, বোমা ফেলার জন্যে প্লেন তৈরি করেছে যেটা নাকি রাডারে দেখা যায় না। সেরকম কিছু—

স্যার চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লেন, কিন্তু সেটা তো যুদ্ধ করার প্লেন। মহাকাশের একটা প্রাণী কি যুদ্ধ করতে আসবে?

লিটন বলল, আমি যে সিনেমাটা দেখেছি—

তারিক বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু টেলিস্কোপ দিয়েও তো দেখতে পারে নাই।

স্যার মাথা নাড়লেন, তা ঠিক। তা ঠিক।

মাহবুব বলল, অদৃশ্য কোনো জিনিস দিয়ে হয়তো তৈরি।

অদৃশ্য জিনিস তো কিছু নেই, স্যার মাথা নাড়লেন, যেখান থেকেই আসুক সেটা তৈরি হতে হবে একই জিনিস দিয়ে, যে-এক শ' চারটা মৌলিক পদার্থ আছে, তার বাইরে তো কিছু থাকতে পারে না।

ক্লাসে সবচেয়ে যে কম কথা বলে, সুব্রত, আস্তে আস্তে বলল, এমন কি হতে পারে যে মহাকাশের প্রাণী সাইজে অনেক ছোট হয়, পিঁপড়ার মতো, কিংবা আরো ছোট, যে খালিচোখে দেখা যায় না?

সারা ক্লাস হো হো করে হেসে উঠল। স্যার নিজেও হাসতে হাসতে ধমক দিলেন সবাইকে, হাসছিস কেন তোরা বোকার মতো? হাসছিস কেন? ছোট তো হতেই পারে—

হাসতে হাসতে হঠাৎ আমি ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতো করে চমকে উঠলাম। আমার সেই বিচিত্র পোকাটার কথা মনে পড়ল আর হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম সুব্রত ঠিকই বলেছে, বিজ্ঞানীরা সেটাকে দেখতে পায় নি, কারণ সেটা অনেক ছোট, আমি সেটাকে পেয়েছি, পেয়ে হোমিওপ্যাথিক শিশির মাঝে আটকে রেখেছি।

চিৎকার করে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠছিলাম, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। স্যার একটু অবাক হয়ে বললেন, কি রে বিলু, কিছু বলবি?

না না না, স্যার। আমি আমতা আমতা করে বললাম, ইয়ে, মানে—বলছিলাম, মহাকাশের প্রাণী তো ছোট হতে পারে। পারে না, স্যার?

পারবে না কেন? অবশ্যি পারে। সব প্রাণীরই যে আমাদের মতো সাইজ হতে হবে কে বলেছে? ডাইনোসোর কত বড় ছিল, জীবাণু কত ছোট। কাজেই একটা প্রাণীকে কত বড় হতে হবে তার তো কোনো নিয়ম নেই।

স্যার আরো কি কি বললেন, কিন্তু আমি কিছু শুনছিলাম না। আমার বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ডে ঢাকের মতো শব্দ করছে, উত্তেজনায় নিঃশ্বাস নিতে পারছি না, হাত অল্প অল্প কাঁপছে। আমি সত্যিই কি মহাকাশের সেই প্রাণীটাকে ধরেছি?

বাসায় গিয়ে সেই প্রাণীটাকে আবার দেখতে হবে, কিন্তু স্কুল ছুটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছিলাম না, তাই অঙ্ক ক্লাসে পেট চেপে কোঁ কোঁ করে স্যারকে বললাম, খুব পেটব্যথা করছে স্যার, বাসায় যেতে হবে এক্ষুণি।

অঙ্ক–স্যার যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন জানতাম না। সকালে কি খেয়েছি, রাতে কি খেয়েছি, দাস্ত হয়েছে কি না, বাহ্যি হয়েছে কি না এইসব একগাদা প্রশ্ন করে দুই দানা অ্যান্টিমনি সিক্স হানড্রেড খাইয়ে বেঞ্চে শুইয়ে রাখলেন। স্যার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন আর পকেটে নানারকম ওষুধ নিয়ে ঘুরে বেড়ান জানলে কখনোই স্যারকে পেটব্যথার কথা বলতাম না। শক্ত বেঞ্চে শুয়ে থাকা আরামের কিছু ব্যাপার নয়, তাই একটু পরে বললাম যে আমার পেটব্যথা কমে গেছে। শুনে অঙ্ক স্যারের মুখে কী হাসি।

বিকেলে বাসায় এসে আমি দৌড়ে আমার ঘরে গেলাম। বালিশের নিচে হোমিওপ্যাথিক শিশিতে সেই পোকাটি রেখেছিলাম—যেটা হয়তো আসলে মহাকাশের সেই রহস্যময় প্রাণী। আমি সাবধানে সেই শিশিটা হাতে নিলাম, এক কোনায় কালো বিন্দুর মতো সেই জিনিসটি। আমি আস্তে আস্তে শিশিতে একটা টোকা দিলাম, সাথে সাথে ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর ভিতর থেকে কে যেন ক্ষীণ স্বরে বলল, সাবধান।

উত্তেজনায় আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করে ভালো করে সেটাকে দেখার চেষ্টা করলাম, অবিশ্বাস্য রকম জটিল একটা যন্ত্র। তার ভিতর থেকে একটা ফুটো দিয়ে মাথা বের করে একটি অত্যন্ত ছোট প্রাণী আমার দিকে তাকিয়ে আছে, সত্যি সত্যি একটা বড় মাথা আর দু'টি চোখ। বুদ্ধিমান প্রাণীর যে–রকম থাকার কথা। আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে?

প্রাণীটি খানিকক্ষণ ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করল, তারপর বলল, তুমি কে?

আমি বিলু।

বিলু। বিলু দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন।

হোমোস্যাপিয়েন মানে মানুষ, প্রাণীটি আমাকে দায়িত্বহীন মানুষ বলছে, আমি নিশ্চয়ই কিছু–একটা কাজ খুব ভুল করেছি। ঢোক গিলে বললাম, আমি আসলে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চাই নি, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই—

ঠিক তখন ছোট খালা ঘরে উঁকি দিলেন, আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে কথা বলছিস রে, বিলু?

আমি চট করে শিশিটা বালিশের নিচে লুকিয়ে ফেললাম, কিন্তু কোনো লাভ হল না, প্রাণীটা তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন। দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন!!

===

ছোট খালা প্রাণীটির কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না, আমাকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, কার সাথে কথা বলছিলি?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কারো সাথে না, ছোট খালা।

প্রাণীটা তখনও চিৎকার করছে, দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন।

ছোট খালা মনে হল কিছু-একটা শুনলেন, ঘরে মাথা ঢুকিয়ে বললেন, ঘরে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে?

আমি ঢোক গিলে বললাম, হ্যাঁ।

ছোট খালা খানিকক্ষণ ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনে আমার দিকে একটু অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে চলে গেলেন। আমি তখন আর শিশিটা বের করার সাহস পেলাম না। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে। খুব সাবধানে।

রাতে খাবার টেবিলে আমি ছোট খালুকে জিজ্ঞেস করলাম, খালু, কেউ যদি মহাকাশের সেই প্রাণীকে দেখতে পায় তাহলে তার কী করা উচিত?

খালু অবাক হয়ে বললেন, মহাকাশের কী প্রাণী?

আমি বললাম, খবরের কাগজে যে উঠেছে।

কী উঠেছে?

আমি খবরটা বললাম, ছোট খালু খবরটাকে মোটেও গুরুত্ব দিলেন না। হাত নেড়ে বললেন, ধুর, সব লোক-ঠকানোর ফন্দি। খবরের কাগজ বিক্রি করার জন্যে যত সব গাঁজাখুরি গল্প!

কিন্তু যদি সত্যি হয় তাহলে কার সাথে যোগাযোগ করবে?

সত্যি হবে না।

যদি হয়?

ছোট খালু একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, তারপর ইতস্তত করে বললেন, পুলিশকে নিশ্চয়ই।

সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি বালিশের নিচে থেকে ছোট শিশিটা বের করলাম, ভিতর থেকে একটা হালকা নীল আলো বের হচ্ছে। কাছে মুখ নিয়ে বললাম, হে মহাকাশের আগন্তুক।

ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর শুনলাম সেটি বলল, বিলু। দায়িত্বহীন হোমোস্যাপিয়েন।

প্রাণীটা আবার আমাকে গালি দিচ্ছে, আমার এত খারাপ লাগল যে বলার নয়। থতমত খেয়ে বললাম, আমি আসলে বুঝতে পারি নি, একেবারেই বুঝতে পারি নি—

ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ হল, তারপর একটা কাতর শব্দ করল প্রাণীটা, বলল, বিপদ, মহাবিপদ, আটানব্বই দশমিক তিন চার বিপদ—

কার বিপদ?

আমার।

কী বিপদ?

প্রাণীটা কোনো কথা না বলে ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে থাকে। আমি

আবার জিজ্ঞেস করলাম, কী বিপদ? কী হয়েছে?

প্রাণীটা কোনো উত্তর দিল না, ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে থাকল। আমার মনে হল শব্দটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে। প্রাণীটা যদি মরে যায় তখন কী হবে?

আমার তখন এই প্রাণীটার জন্যে এত মন-খারাপ হয়ে গেল, বলার নয়। আহা বেচারা, না-জানি কোন দূর-দূরান্তের এক গ্রহ থেকে এসে এখানে কী বিপদে পড়েছে! কি বিপদ বলতেও পারছে না! বাংলা যে বলতে পারে সেটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার। মানুষের মতো কথা বলে না, অন্যরকমভাবে বলে, তাই সবাই শুনে বুঝতে পারে না। ছোট খালা যেরকম বোঝেন নি। এখন এত দুর্বল হয়ে গেছে যে আর কথাও বলতে পারছে না। কী করা যায় আমি চিন্তা করে পেলাম না। ছোট খালুকে কি ডেকে তুলে বলব? কিন্তু কী বলব? মহাকাশের প্রাণী একটা হোমিওপ্যাথিক শিশিতে অসুস্থ হয়ে আছে? একজন ডাক্তার ডাকা দরকার? ছোট খালু তো বিশ্বাসই করবেন না। স্যারকে বলতে পারলে হত, কিন্তু এই মাঝরাতে স্যারকে আমি কোথায় পাব?

আমি অনেকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করলাম। প্রাণীটাকে যখন পেয়েছি তখন সেটাকে ঘিরে ছিল অসংখ্য পিঁপড়া। পিঁপড়াগুলো মনে হচ্ছিল প্রাণীটাকে কোনোভাবে সাহায্য করছিল। প্রাণীটা যদি আমার সাথে কথা বলতে পারে, নিশ্চয়ই তাহলে পিঁপড়াদের সাথেও কোনোরকম কথা বলতে পারে। মানুষের মতো পিঁপড়াদের এত বুদ্ধি নেই, তাদের সাথে কথা বলা হয়তো আরো সহজ। আমি আবার যদি প্রাণীটাকে পিঁপড়াদের মাঝে ছেড়ে দিই, তাহলে কি কোনো লাভ হবে?

কোনো ক্ষতি তো আর হতে পারে না।

আমি খুঁজে খুঁজে কয়েকটা পিঁপড়া বের করে শিশিটার কাছে এনে ছেড়ে দিলাম। পিঁপড়াগুলো সাথে সাথে শিশিটাকে ঘিরে ঘুরতে শুরু করল, আর কী অবাক কাণ্ড, কিছুক্ষণের মাঝে দেখি পিঁপড়ার একটা সারি শিশিটার দিকে এগিয়ে আসছে। শিশিটাকে গোল হয়ে ঘিরে পিঁপড়াগুলো দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

ভিতর থেকে আবার ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ হতে থাকে, শব্দটি আগের থেকে অনেক দুর্বল। আমি সাবধানে শিশিটার মুখ খুলে দিলাম, সাথে সাথে একটা পিঁপড়া ভিতরে ঢুকে গেল। সেটা বের হয়ে এল একটু পরে, তখন আরেকটা পিঁপড়া ভিতরে গিয়ে ঢুকল। সেটা বের হয়ে এলে আরেকটা। পিঁপড়াদের মাঝে একটা উত্তেজনা, ছুটে যাচ্ছে ছুটে আসছে, মুখে করে কিছু-একটা আনছে, কিছু-একটা নিয়ে যাচ্ছে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

আমি নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দটা অনেক বেড়েছে। আমি শিশিটার ভিতরে তাকালাম, সেখানে কিছু নেই। শব্দটা কোথা থেকে আসছে দেখার জন্যে আমি এদিকে-সেদিকে তাকালাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা নীল আলো ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ করে সেটা আমার দিকে এগিয়ে এসে ঠিক নাকের কাছাকাছি থেমে গেল, শুনলাম সেটা বলল, মস্তিষ্কের কম্পন স্তিমিত, শারীরিক নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত—।

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

ঘুম?

===

হ্যাঁ।

সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় সময়ের অপচয়। সময়ের অপচয়—

জিনিসটা ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠে গিয়ে আবার নিচে নেমে এল। বলল, বুদ্ধিমত্তার হার শতকরা চুয়াল্লিশ দশমিক তিন।

কার?

তোমার।

সেটা ভালো না খারাপ?

ভালো? খারাপ? ভালো? খারাপ? জিনিসটা উত্তর না দিয়ে আবার ঘুরপাক খেতে থাকে। মনে হচ্ছে এর সাথে কথাবার্তা চালানো খুব সহজ নয়। কিন্তু যে–বিপদের কথা বলছিল সেটা মনে হয় কেটে গেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার মহাবিপদ হয়েছিল বলেছিলে, সেটা কেটেছে?

চল্লিশ দশমিক চার।

সেটা কম না বেশি?

কম? বেশি ? কম? বেশি ? জিনিসটা উপরে–নিচে করতে থাকে।

আমি হাল ছাড়লাম না, জিজ্ঞেস করলাম, পিঁপড়াগুলো কি তোমাকে সাহায্য করতে পেরেছে?

লৌহ তাম্র কোবাল্ট এবং অ্যান্টিমনি।

এগুলো এনে দিয়েছে?

বাস্তবিক। স্বর্ণ কিংবা প্লাটিনাম চাই। স্বর্ণ । স্বর্ণ।

সোনা দরকার তোমার?

বাস্তবিক।

সোনা না হলে কী হবে?

গতিবেগ রুদ্ধ।

কার গতিবেগ রুদ্ধ?

মহাকাশযানের।

কতটুকু দরকার?

ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম।

সেটা কতটুকু?

ছয় দশমিক তিন—ছয় দশমিক তিন—বলে জিনিসটা আবার ঘুরপাক খেতে থাকে। ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম সোনা খুব বেশি নয়, কিন্তু যত কমই হোক, সোনা আমি কোথায় পাব? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

এন্ড্রোমিডা। এন্ড্রোমিডা।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে? সত্যি?

সত্যি? সত্যি? সত্যি?

সে তো অনেক দূরে। কেমন করে এলে?

স্পেস টাইম সংকোচনের অস্থিতিশীল অবস্থায় মূল কম্পনের চতুর্থ পর্যায়ের সর্বশেষ বিস্ফোরণের ফলে যে সময় পরিভ্রমণের ক্রান্তিধারা হয় তার দ্বিতীয় পর্যায়ে......

আমি হাত তুলে থামালাম, তুমি একা এসেছ?

একা? একা? একা?

কতদিন থাকবে তুমি?

স্বর্ণ স্বর্ণ স্বর্ণ চাই। ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম স্বর্ণ চাই। আমার গতিবেগ রুদ্ধ।

ঠিক এই সময়ে দরজা খুলে ছোট খালা মাথা ঢোকালেন। বললেন, বিলু—

আমি ভীষণ চমকে উঠলাম, ছোট খালা?

এত রাতে জেগে একা একা কথা বলছিস কেন?

আমি মানে ইয়ে—মানে—আমি থতমত খেয়ে থেমে গেলাম। ছোট খালা ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, অনেক রাত হয়েছে, ঘুমা।

আমি তাড়াতাড়ি মশারি ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ছোট খালা বাতি নিভিয়ে দিয়ে বের হয়ে গেলেন। সাথে সাথে ঘরের কোনা থেকে জিনিসটি বের হয়ে এল, বলল, বিভ্রান্ত হোমোস্যাপিয়েন।

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি?

নাম? নাম? নাম?

হ্যাঁ, নাম।

সাত তিন আট দশমিক চার চার দুই মাত্রা সাত নয় উল্টো মাত্রা ছয় ছয় পাঁচ—

এটা তো নাম হতে পারে না। নাম হতে হবে ছোট।

ছোট?

হ্যাঁ, ছোট।

জিনিসটা এবার অদ্ভুত একটা শব্দ করল। হাঁচি আটকে রাখার চেষ্টা করতে গিয়ে হঠাৎ হাঁচি বের হয়ে গেলে নাক এবং মুখ দিয়ে যেরকম অদ্ভুত একটা শব্দ বের হয়, শব্দটা অনেকটা সেরকম। আমি দু'বার সেটা অনুকরণ করার চেষ্টা করলাম, কোনো লাভ হল না। বললাম, তোমাকে অন্য একটা নাম দিই, যেটা ডাকা যায়?

অন্য নাম? নূতন নাম?

হ্যাঁ। তুমি যখন ছোট, তাই ছোট একটা নাম। ছোটন কিংবা টুকুন।

টুকুন? টুকুন? জিনিসটি ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করতে শুরু করল।

হ্যাঁ, তুমি যদি চাও তাহলে টুকুন ঝিঁঝি হতে পারে। কিংবা টুকুনজিল—

টুকুনজিল টুকুনজিল টুকুনজিল—জিনিসটা আমার মশারির চারদিকে ঘুরতে থাকে। আমার মনে হয় নামটা তার পছন্দ হয়েছে।

ঠিক আছে, তা হলে তোমার নাম হোক টুকুনজিল।

টুকুনজিল হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, বিভ্রান্ত হোমোস্যাপিয়েন।

বিভ্রান্ত কে?

বিভ্রান্ত এবং আতঙ্কিত হোমোস্যাপিয়েন।

আতঙ্কিত কে?

বিভ্রান্ত এবং আতঙ্কিত এবং স্তম্ভিত হোমোস্যাপিয়েন।

আমি হঠাৎ করে ছোট খালার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার দরজার কাছ থেকে দ্রুত হেঁটে নিজের ঘরে যাচ্ছেন। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে আমার কথা শুনছিলেন। কী সর্বনাশ।

==

৮. ডাক্তার

সকালে ছো খালু জামাকাপড় পরে আমার ঘরে এসে বললেন, বিলু, আজকে তোমার স্কুলে যেতে হবে না।

স্কুলে যাব না?

না।

কেন খালু?

আমার সাথে একটু বাইরে যাবে।

বা-বাইরে? কোথায়?

একজনের সাথে দেখা করতে।

ছোট খালু বেশি কথা বলেন না, আমার তাই কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। কাল রাতের ব্যাপার নিয়ে কি কিছু হয়েছে?

কি ব্যাপার একটু পরেই বল্টুর কাছে জানতে পারলাম। সে আমার ঘরে উঁকি দিয়ে আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। বল্টুর পিছনে মিলি। বল্টু মিলির দিকে তাকিয়ে বলল, কাছে যাস না, কামড়ে দেবে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কে কামড়ে দেবে?

তুমি।

আমি? কেন?

তোমার বাবার মতো তুমিও পাগল হয়ে যাচ্ছ। মা বলেছে।

আমি? আমি পা—পা—

মিলি বল্টুকে ধমক দিয়ে বলল, ভাইয়া, মা বলতে না করেছে না?

চুপ।

আমি উঠে দাঁড়াতেই বল্টু ছুটে বের হয়ে গেল, তার পিছনে পিছনে মিলি। দু'জনেই ভয় পেয়েছে আমাকে দেখে। আমার এমন মন-খারাপ হল যে বলার নয়।

গাড়িতে ছোট খালু বেশি কথা বললেন না। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, রাতে ভালো ঘুম হয়েছে, বিলু?

জ্বি, হয়েছে।

কখনো ঘুমাতে অসুবিধে হয় তোমার?

না, খালু।

বেশ, বেশ।

সারা রাস্তা আর কোনো কথা হল না। আমি গাড়িতে বসে এদিকে-সেদিকে দেখছিলাম, তখন দেখলাম একটা মাইক্রোবাস আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে আসছে। আমার মনে হল এই মাইক্রোবাসটাকে কয়দিন থেকে বাসার সামনে দেখছি। একটু পরে অবশ্যি মাইক্রোবাসটার কথা ভুলে গেলাম, এখানে তো কত মাইক্রোবাসই আছে।

মতিঝিলের কাছে একটা উঁচু দালানে লিফট দিয়ে আমাকে নিয়ে উঠে গেলেন ছোট

খালু। একটা সরু করিডোর ধরে হেঁটে একটা বন্ধ দরজায় টোকা দিলেন। দরজায় সোনালি অক্ষরে লেখা ডঃ কামরুল ইসলাম, নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ।

ডাক্তার ছোট খালুর খুব বন্ধুমানুষ হবেন। দেখলাম একজন আরেকজনকে দেখে বাচ্চাদের মতো পেটে খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন। আর একটু পরপর হো হো করে হাসছেন। আমি এর আগে ছোট খালুকে কখনো জোরে হাসতে দেখি নি। একটু পর দু'জনেই সরে গিয়ে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করলেন। আমি বুঝতে পারলাম, আমাকে নিয়ে কথা হচ্ছে, কারণ দু'জনেই খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, আর ''প্রেশার'' ''কালচার'' "ডিজঅর্ডার'' ''ব্রাইট'' এরকম কঠিন কঠিন কয়েকটা শব্দ শুনতে পেলাম আমি। একটু পর ছোট খালু আমার কাছে এসে বললেন, বিলু, এ হচ্ছে ডক্টর কামরুল, তোমার ডাক্তার চাচা। তোমার সাথে খানিকক্ষণ কথা বলবেন। তোমাকে যেটা জিজ্ঞেস করবেন তুমি তার ঠিক উত্তর দেবে। ঠিক আছে?

খালু। আমার কিছু হয় নি, খালু। আমি ভালো আছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি অবশ্যি ভালো আছ।

তাহলে কেন—

ভালো থাকলেও ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। চেক-আপের জন্যে যেতে হয়। সবাই যায়।

ডাক্তার চাচা খুব ভালোমানুষের মতো আমার হাত ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে বললেন, তোমার খালু আর আমি যখন ছোট ছিলাম একসাথে অনেক মারপিট করেছি।

আমি আবার তাকালাম তাঁদের দিকে। তাঁরা একসময় ছোট ছিলেন এবং মারপিট করেছেন ব্যাপারটা বিশ্বাসই হতে চায় না। ডাক্তার চাচা মুখে হাসি টেনে বললেন, তোমার খালু আমাকে বলেছেন যে তুমি নাকি অসম্ভব ব্রাইট ছেলে। গ্রামের একটা স্কুল থেকে স্কলারশিপে পুরো ডিস্ট্রিক্টের মাঝে প্রথম হয়েছ।

আমি কিছু বললাম না, একটু মাথা নাড়লাম।

ডাক্তার চাচা বললেন, তোমার বাবার নাকি একটু মানসিক ব্যালেন্সের সমস্যা আছে। বোঝই তো, কারো বেশি হয় কারো কম। আমি তাই তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই, কারণ, দেখা গেছে অনেক সময় এগুলো জিনেটিক হয়। জিনেটিক মানে বোঝ তো? বংশগত। বাবার থেকে ছেলে, ছেলে থেকে তার ছেলে। তোমার মতো এরকম একজন ব্রাইট ছেলে, তার নিজের উপর কন্ট্রোল থাকা খুব দরকার। ঠিক আছে?

জ্বি।

এবারে বল, তুমি কি কখনো কিছু দেখতে পাও, যেটা অন্যেরা দেখতে পায় না।

না।

কখনো কিছু শুনতে পাও যেটা অন্যেরা শুনতে পায় না?

ইয়ে-আগে কখনো হয় নি। কিন্তু সেদিন—

সেদিন কি?

সেদিন মহাকাশের আগন্তুকের সাথে দেখা হল, সে যখন কথা বলে তখন অন্যেরা

==

মনে হয় বুঝতে পারে না।

বুঝতে পারে না?

না। তারা শুধু ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ শোনে।

কে শুনেছে সেটা?

ছোট খালা।

ও। একটু থেমে ডাক্তার চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন, ঝিঁঝি পোকা?

জ্বি।

তুমি কি অন্য কোনো পোকার কথা শুনতে পার? কিংবা অন্য কোনো প্রাণী? কুকুর, বেড়াল, পাখি? কাক? দাঁড়কাক?

হঠাৎ করে কেন জানি আমার রাগ উঠতে থাকে। বড়দের সাথে রাগ করে কথা বলতে হয় না, তাই আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বললাম, না।

শুধু ঝিঁঝি পোকার শব্দ?

আমি কখনো বলি নি যে আমি ঝিঁঝি পোকার শব্দ শুনতে পারি। আমি বলেছি—

কী বলেছ?

আমি বলেছি মহাকাশের যে-আগন্তুক এসেছে তার কথা অন্যেরা শোনে ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো।

কেন সেটা হয় বলতে পার?

আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মহাকাশের আগন্তুকের কথা বললাম, কিন্তু ডাক্তার চাচা সেটা নিয়ে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। কথাটা শুনে অবাকও হলেন না। পুরো ব্যাপারটাতে কোনো গুরুত্ব দিলেন না, সেটা দেখে আমার আরো রাগ উঠতে লাগল, তবুও অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে রাখলাম। ডাক্তার চাচা জিজ্ঞেস করলেন, কেন অন্যেরা শুনতে পায় না তুমি জান?

একটু একটু জানি।

কেন?

আমার মনে হয় সে আমাদের মতো কথা বলে না। একটা তরঙ্গ পাঠায়, সেটা সোজাসুজি আমাদের মাথার মাঝে, মগজের মাঝে কম্পন তৈরি করে। সেটার থেকে আমরা বুঝি সে কী কথা বলছে। একেকজনের মগজ একেক রকম, তাই একেকজনের জন্যে একেক রকম কম্পন দরকার। মহাকাশের আগন্তুক আমার কম্পনটা ধরতে পেরেছে, সে ঠিক তরঙ্গটা পাঠায় তাই আমি তার কথা বুঝতে পারি। অন্যেরা বোঝে না। যখন অন্যদের জন্যে পাঠাবে তখন আমি বুঝব না। শুধু একটা শব্দ শুনব ঝিঁঝি পোকার শব্দের মতো।

ডাক্তার চাচা মনে হল আমার কথা শুনে খুব অবাক হলেন। একবার খালুর দিকে তাকালেন, তারপর আমার দিকে তাকালেন, তারপর কাগজে ঘসঘস করে কী-একটা লিখলেন। একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন, এই প্রাণীটা কোন গ্রহ থেকে এসেছে? মঙ্গল গ্রহ?

মঙ্গল গ্রহে কোনো প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতে পৃথিবী ছাড়া আর কোনো গ্রহে প্রাণ নেই।

তাহলে কোথা থেকে এসেছে?

এন্ড্রোমিডা থেকে।

সেটা কোথায়?

আমাদের নেবুলার নাম হচ্ছে ছায়াপথ। ইংরেজিতে বলে মিল্কিওয়ে। আমাদের পরেরটা হচ্ছে এন্ড্রোমিডা। সেখানকার কোনো নক্ষত্রের কোনো–একটা গ্রহ থেকে।

সেটা নিশ্চয়ই অনেক দূর। সেখান থেকে কেমন করে এল?

আমাকে বলেছে, আমি বুঝি নি। স্পেস টাইমের কী–একটা ব্যাপার আছে। একরকম সংকোচন হয়, তখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ডাইভ দিয়ে চলে যায়। সময়ের ক্ষেত্র ব্যবহার করে স্থানের ক্ষেত্রে শর্টকাট দেয়ার মতো।

ডাক্তার চাচা ঢোক গিলে বললেন, সেই প্রাণীটা তোমাকে বলেছে এটা?

এভাবে বলে নি, আমি এভাবে বললাম। সোজাসুজি মগজের মাঝে কথা বলে, তাই তার সব কথা বুঝতে না পারলেও কী বলতে চায় বুঝতে পারি।

ডাক্তার চাচা ঘসঘস করে খানিকক্ষণ লিখে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোথায় আছে সেই প্রাণী?

জানি না। রাতে আমার ঘরে ছিল।

তুমি আর কাউকে এটা বলেছ?

না, এখনো বলি নি।

সেটা দেখতে কী রকম?

অনেক ছোট, তাই ভালো করে দেখতে পারি নি।

ছোট? ডাক্তার চাচা মনে হল খুব অবাক হলেন।

হ্যাঁ। অনেক ছোট। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুব কষ্ট করে একটু দেখা যায়।

এত ছোট?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানতে এটা ছোট হবে?

আমি কেমন করে জানব?

তুমি এখনো কাউকে এটা বল নি?

না।

কাউকে বলবে ঠিক করেছ?

হ্যাঁ। আজকে স্কুলে গেলে স্যারকে বলতাম।

তোমার স্যার?

হ্যাঁ। আমাদের ক্লাস টিচার। স্যারের খুব উৎসাহ।

ও। ডাক্তার চাচা আবার ঘসঘস করে অনেক কিছু লিখে ফেললেন কাগজে। তারপর স্যারের কথা জিজ্ঞেস করতে শুরু করলেন। স্যার কি করেন, ক্লাসে কাকে বেশি পছন্দ করেন, কাকে বেশি অপছন্দ করেন। আমি সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম। তারপর বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন, অনেক খুঁটিনাটি জিনিস জানতে চাইলেন। বাবার পর আমার নিজের সম্পর্কে জানতে চাইলেন, কী করতে ভালবাসি, কী খেতে ভালবাসি, কোন রং আমার পছন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি। সবার শেষে আমাকে অনেকগুলো ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কী মনে করি। একটা বিচিত্র ধরনের পরীক্ষা নিলেন আমার, নানারকম নকশা দেখে ঠিক উত্তরটা বেছে নেবার একটা পরীক্ষা।

===

তারপর আবার কাগজে ঘসঘস করে কী যেন লিখলেন। তারপর অনেকক্ষণ বসে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শেষ পর্যন্ত খালুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর ভাগ্নে খুব ব্রাইট। অসম্ভব হাই আই কিউ। আমার মনে হয় তাকে সোজাসুজি বলে দেয়া ভালো। তোর আপত্তি আছে?

খালু মাথা নাড়লেন, না, নেই।

ডাক্তার চাচা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি তোমার বাবাকে খুব ভালবাস, খুব কম বাচ্চা তার বাবাকে এত ভালবাসে।

আমি মাথা নাড়লাম।

কিন্তু তোমার বাবা পুরোপুরি স্বাভাবিক নন, তাই তাঁর সাথে তোমার কখনো সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে নি। তোমার বুকের ভিতরে সেটা নিয়ে বুভুক্ষের মতো একটা ক্ষুধা আছে।

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

এখানে এসে স্কুলে তোমার যে–স্যারের সাথে পরিচয় হয়েছে, সেই স্যারের সাথে তোমার বাবার একটু মিল রয়েছে। তুমি তোমার নিজের বাবার কাছে যেটা পাও নি, সেটা তোমার স্যারের মাঝে তুমি খোঁজা শুরু করেছ। তোমার স্যার খুব ভালো মানুষ, ছাত্রদের নিজের সন্তানের মতো করে দেখেন—তুমিও গোপনে তাঁকে তোমার বাবার মতো করে দেখা শুরু করেছ। তোমার স্যার যেটাই বলেন তুমি সেটা গভীরভাবে বিশ্বাস কর। তাঁকে খুশি করার জন্যে তোমার অবচেতন মন নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকে। তাই যখন তোমার স্যার মহাকাশের প্রাণীর কথা বলেছেন, সেটাও তুমি এমনভাবে বিশ্বাস করেছ, যে—

ডাক্তার চাচা একটু থেমে খালুর দিকে তাকালেন, তারপর আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি সত্যিই বিশ্বাস করা শুরু করেছ যে সত্যি সত্যি মহাকাশের একটা আগন্তুক তোমার কাছে এসে গেছে। এরকম হয়—একজন মানুষ যখন আরেকজন মানুষকে খুব ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে, তখন এরকম হয়। এর একটা ডাক্তারি নামও আছে।

আমি ঢোক গিলে বললাম, তার মানে আপনি বলছেন টুকুনজিল আসলে নেই?

টুকুনজিল?

হ্যাঁ। মহাকাশের আগন্তুককে আমি টুকুনজিল নাম দিয়েছি।

ও।

আপনি বলছেন টুকুনজিল আসলে নেই?

না। আসলে সব তোমার কল্পনা। মানুষ একটা জিনিস যদি খুব বেশি চায়, সেটা নিয়ে যদি তার ভিতরে একটা বড় ধরনের দুঃখ কিংবা ক্ষোভ থাকে, সেটা যদি সে তার প্রকৃত জীবনে না পায়, তখন সে সেটা কল্পনায় পেতে চেষ্টা করে। সেটা কোনো দোষের ব্যাপার নয়, সবার জীবনেই নানারকম ফ্যান্টাসি থাকে। খানিকটা ফ্যান্টাসি থাকা ভালো। কিন্তু কখনো যদি কেউ কল্পনা এবং সত্যিকার জীবনে গোলমাল করে ফেলে, বুঝতে না পারে কোনটা কল্পনা এবং কোনটা সত্যি, তখন অসুবিধে। আমরা তাদের বলি মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ। তোমার বাবা সেরকম একজন মানুষ। কল্পনা এবং বাস্তব জীবনের মাঝে পার্থক্যটা ধরতে পারেন না। তোমার ভিতরেও তার

লক্ষণ আছে—

আমার ভিতরে?

হ্যাঁ। তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে, তাই তোমাকে সোজাসুজি বললাম। যদি তুমি নিজে একটু সতর্ক থাক, তাহলে নিজেই বুঝবে কোনটা সত্যি, কোনটা কল্পনা। যখন বুঝতে পারবে তুমি কল্পনাকে সত্যি মনে করছ, তখন নিজেকে জোর করে কল্পনার জগৎ থেকে সরিয়ে আনবে। কল্পনা করতে কোনো দোষ নেই, কিন্তু কল্পনাকে কখনো সত্যি বলে ভুল করতে হয় না। বুঝেছ?

বুঝেছি। আমার গলা শুকিয়ে গেল। তার মানে আমিও বাবার মতো পাগল।

তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমার ভিতরে অসম্ভব মনের জোরের চিহ্ন পেয়েছি। তুমি এর ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারবে। আমি জানি। তোমার বাবার যেটা হয়েছে তোমার সেটা হবে না। কখনো হবে না। ঠিক আছে?

আমি মাথা নাড়লাম।

বাসায় এসে বালিশে মাথা রেখে আমি খানিকক্ষণ কাঁদলাম। আমি ভেবেছিলাম মহাকাশের রহস্যময় এক প্রাণীর সাথে আমার যোগাযোগ হয়েছে। আসলে সব আমার পাগল–মাথার কল্পনা। সবাই এখন জেনে যাবে যে আমি পাগল। ছোট খালু বলবেন ছোট খালাকে। ছোট খালা থেকে জানবে বল্টু আর মিলি। তাদের থেকে জানবে তাদের অন্য বন্ধুরা। সেখান থেকে একসময় জানবে আমার ক্লাসের ছেলেরা। সবাই তখন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। কী লজ্জার কথা! একবার মনে হল ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে জীবন শেষ করে দিই। আরেকবার মনে হল সব ছেড়েছুড়ে আমি এখনই বাড়ি চলে যাই, সেখানে বাবার হাত ধরে আমরা দুইজন পাগল–মানুষ নীল গাঙের তীরে বসে থাকি।

অনেকক্ষণ বসে বসে আমি ভাবলাম, তারপর নিজেকে সাহস দিলাম। ডাক্তার চাচা বলেছেন আমার মনের জোর আছে, আমি ভালো হয়ে যেতে পারব। আমি নিশ্চয়ই তার চেষ্টা করব। নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। মন–খারাপ করে থেকে লাভ কি?

আমি সোজা হয়ে বিছানায় বসেছি আর সাথে সাথে ঝিঁঝি পোকার মতো একটা শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর শুনলাম পরিষ্কার গলায় কে যেন বলল, তোমার মস্তিষ্কের দুই পাশে অন্ত তরঙ্গ। অসামঞ্জস্য এবং ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম।

আমি চমকে উঠলাম। কী সর্বনাশ! আবার আমি টুকুনজিলের কথা শুনছি। আমি দুই হাতে কান চেপে ধরলাম, টুকুনজিলের কথা শুনতে চাই না আমি—পাগল হয়ে যেতে চাই না। মনে মনে বললাম, চলে যাও চলে যাও তুমি।

আমি যাব না।

তুমি যাও। তুমি কল্পনা। তুমি মিথ্যা। আমি মনে মনে উচ্চারণ করতে থাকি, তুমি কল্পনা, তুমি কল্পনা, তুমি কল্পনা।

আমি কল্পনা না। না না না। আমি টুকুনজিল।

আমার গলা শুকিয়ে গেল, আমি মুখে কোনো কথা উচ্চারণও করি নি, কিন্তু টুকুনজিল আমার কথার উত্তর দিচ্ছে। ডাক্তার চাচা তাহলে কি সত্যি কথাই বলেছেন? আসলেই সব কল্পনা? আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। আমি ভালো

==

হয়ে যাব, এইসব উল্টোপাল্টা ব্যাপারকে কোনো পাত্তা দেব না। চোখ বন্ধ করে নিজেকে বললাম, সব কল্পনা। সব কল্পনা।

না। কল্পনা না।

তুমি চলে যাও। আমার মন থেকে চলে যাও।

যাব না। যাব না। সাহায্য চাই।

কচু সাহায্য। তুমি দূর হয়ে যাও।

যাব না। স্বর্ণ চাই। প্লাটিনাম চাই।

নিজে জোগাড় করে নাও।

পারছি না। আমার গতিবেগ রুদ্ধ। আমি গতিহীন। শক্তিহীন। চোখ খোল। চোখ খুলে আমাকে দেখ।

আমি আবার চোখ খুলে তাকালাম। সত্যি সত্যি আমার চোখের সামনে ছোট একটা কালো বিন্দুর মতো কী-একটা ঝুলছে। টুকুনজিলের মহাকাশযান, নাকি আমার কল্পনা? আমি আবার চোখ বন্ধ করলাম। বললাম, চলে যাও তুমি।

যাব না। যাব না। যাব না।

কেন যাবে না?

যেতে পারব না। সাহায্য চাই। আমাকে খুঁজছে। আমাকে ধরতে আসছে। আমার বিপদ।

তোমার বিপদ, তুমি কচুপোড়া খাও।

আমি কচুপোড়া খাই না। আমাকে সাহায্য কর তুমি।

কিন্তু তুমি তো নেই, তুমি কল্পনা।

আমি কল্পনা না। আমি প্রমাণ করব। তুমি হাত বাড়াও।

আমি আস্তে আস্তে হাত বাড়ালাম, দেখলাম বিন্দুটি আমার হাতের উল্টোপৃষ্ঠায় নেমে এল, হঠাৎ একঝলক আলো জ্বলে উঠল, আর আমি চিৎকার করে হাত টেনে নিলাম। অবাক হয়ে দেখলাম গোল হয়ে পুড়ে গেছে হাতের চামড়া, মুহূর্তে ফোস্কা পড়ে গেছে হাতে। প্রচণ্ড জ্বালা করছে হাত, কিন্তু আমি যন্ত্রণার কথা ভুলে গেলাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম হাতের দিকে। তাহলে কি সত্যিই টুকুনজিল আছে?

তোমার অন্য হাত দাও।

কেন?

আরেকটা বৃত্তাকার উত্তপ্ত চিহ্ন করে দেখাই।

না না, আর দেখাতে হবে না।

এখন তুমি বিশ্বাস কর আমি সত্যি?

প্রচণ্ড জ্বালা করছে হাত। কিন্তু এটাও কি কল্পনা হতে পারে? কাউকে দেখাতে হবে আমার। আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম, বাসার কাজের ছেলেটিকে খুঁজে পেলাম না, তাকে দেখাতাম। বল্টু হেঁটে যাচ্ছিল, তাকেই ডাকলাম আমি, বল্টু, দেখ তো একটা জিনিস।

কি?

আমার হাতের উপর কি তুমি কিছু দেখতে পাও?

দেখি। বল্টু হাতটা একনজর দেখেই চিৎকার করে উঠল, সিগারেটের ছ্যাঁকা! ইয়া

আল্লাহ্, তুমি সিগারেট খাও?

তারপর সে গরুর মতো চেঁচাতে শুরু করল, আম্মা, আম্মা দেখে যাও। বিলু সিগারেট খায়। সিগারেটের ছ্যাঁকা—

ছোট খালা দৌড়ে এলেন, কি হয়েছে? কি?

দেখ, বিলু সিগারেট খেতে গিয়ে হাতে ছ্যাঁকা খেয়েছে। দেখ, গোল ছ্যাঁকা।

ছোট খালা হাতের পোড়া দাগটা খুব ভালো করে দেখলেন, তারপর আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, আমার শরীরে সিগারেটের গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করলেন কয়েকবার, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কেমন করে পুড়েছে?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, না মানে—ইয়ে—।

টুকুনজিলের কথা শুনতে পাই আমি, দেখেছ? আমি সত্যি। আমি কল্পনা না।

আমি ভয়ে ভয়ে তাকালাম। ছোট খালা বা বল্টু টুকুনজিলের কথা শুনতে পায় নি, শুধু আমি শুনেছি।

ছোট খালা বললেন, কথা বলছিস না কেন? কেমন করে পুড়েছে?

বল্টু চিৎকার করে বলল, সিগারেট। সিগারেট।

টুকুনজিল বলল, অকাট্য প্রমাণ আমি সত্যি। অকাট্য প্রমাণ।

আমি চোখ বন্ধ করলাম, মহা ঝামেলায় ফেঁসে গেছি আমি, কিন্তু একটা কথা তো সত্যি।

আমি পাগল না।

মহাকাশের রহস্যময় প্রাণী সত্যি আছে।

সত্যি আছে!

৯. সোনার আংটি

মহাকাশের আগন্তুক টুকুনজিল সত্যি আছে, সে সুদূর এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পৃথিবীতে এসেছে, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা পাগলের মতো তাকে খুঁজছে, সারা পৃথিবীর মাঝে শুধু আমি জানি সে সত্যি আছে এবং কোথায় আছে। শুধু আমার সাথে তাঁর যোগাযোগ হয়েছে, শুধু আমি জানি সে দেখতে কেমন। সে কথা আমি কাউকে বলতে পারছি না, ডাক্তার চাচাকে বলেছিলাম, তিনি বিশ্বাস তো করেনই নি, উল্টো ধরে নিয়েছেন আমিও আমার বাবার মতো পাগল! একদিক দিয়ে ভালোই হয়েছে, কারণ যতক্ষণ টুকুনজিল তার মহাকাশযান ঠিক করতে না পারছে ততক্ষণ সে চায় না অন্য কেউ জানুক সে কোথায় আছে। আমাকে তাই বলেছে, সারা পৃথিবীর মাঝে আমি তার একমাত্র বন্ধু, আমি যদি তার কথা না শুনি কে শুনবে? কাজেই আমার পেটের মাঝে এত বড় খবরটা ভুটভুট করতে থাকে, কিন্তু আমি বের করতে পারছি না।

টুকুনজিল এক টুকরা সোনা বা প্লাটিনামের জন্যে একেবারে জান দিয়ে ফেলছে। সকালে উঠে ঠিক করলাম আজ তাকে সেটা জোগাড় করে দেব। প্লাটিনাম কোথায় পাব আমি, তবে সোনা হয়তো পাওয়া যেতে পারে। ছোট খালার শরীর-ভরা গয়না,

===

হাতে কয়েকটা আংটি, কানে দুল, হাতে চুড়ি। কোনো–একটা কি আর কিছুক্ষণের জন্যে সরিয়ে নেয়া যাবে না? টুকুনজিল নেবে মাত্র ছয় দশমিক তিন মিলিগ্রাম সোনা, ছোট খালা জানতেও পারবেন না।

সকালে নাস্তা করার সময় দেখতে পেলাম ছোট খালার আঙুলে আংটিগুলো নেই, তার মানে নিশ্চয় খুলে রেখেছেন। খুলে রাখার জায়গা খুব বেশি নেই, হয় শোয়ার ঘরে, ড্রেসিং টেবিলের উপরে, নাহয় লাগানো বাথরুমে। আমি ব্যবহার করি বল্টু আর সীমার বাথরুম, কাজেই কোনোরকম সন্দেহ সৃষ্টি না করে শোওয়ার ঘরের বাথরুমে যাওয়া সহজ নয়। তবে কপাল ভালো থাকলে হয়তো বাথরুম পর্যন্ত যেতে হবে না, ড্রেসিং টেবিলের উপরেই পাওয়া যাবে। কিন্তু সে জন্যে আমাকে শোওয়ার ঘরে যেতে হবে। কী ভাবে যাওয়া যায়?

ছোট খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, ছোট খালা, আজকের পেপার কি এসেছে?

এসেছে নিশ্চয়ই। কেন?

আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে বলেছে তার চাচার একটা খবর উঠবে আজকে। সরল মুখ করে একটা নির্দোষ মিথ্যা কথা বললাম।

কী খবর?

অবিরাম সাইকেল চালনা। ছিয়াত্তর ঘন্টা নাকি হয়েছে। মিথ্যা কথা বলার এই হচ্ছে সমস্যা, একটা বললে শেষ হয় না; সেটাকে সামলে নেবার জন্যে একটানা মিথ্যা বলে যেতে হয়।

কোথায় সাইকেল চালাচ্ছে?

নরসিংদি। ছোট খালুর কি পড়া শেষ হয়েছে খবরের কাগজ?

জানি না, দেখ গিয়ে।

সাথে সাথে আমি শোওয়ার ঘরে ঢুকে গেলাম, ছোট খালু নিশ্চয়ই বাথরুমে, ঘরঘর শব্দ করে গলা পরিষ্কার করছেন। বিছানার উপর খবরের কাগজটা পড়ে আছে, সেটা তুলে নেবার আগে ড্রেসিং টেবিলের উপর তাকালাম, কী কপাল! সত্যি সত্যি ছোট খালার সোনার আংটি দুইটা! চট করে একটা তুলে নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে ফেললাম, আগে এরকম বড় জিনিস কখনো চুরি করি নি, বুকটা ধক্‌ধক্ করে শব্দ করতে থাকল।

খাবার টেবিলে বসে মিছেই খবরের কাগজটা দেখার ভান করতে থাকলাম। বল্টু জিজ্ঞেস করল, উঠেছে খবরটা?

নাহ্।

আমি তখনই বুঝেছিলাম গুলপট্টি। তিন দিন কোনো মানুষ একটানা সাইকেল চালাতে পারে? পিশাব–পাইখানা?

আমার ঘরে এসে আমি ফিসফিস করে ডাকলাম, টুকুনজিল—

সোনা এনেছ?

হ্যাঁ। চুরি করে এনেছি, ধরা পড়লে একেবারে জান শেষ হয়ে যাবে।

জান শেষ হয়ে যাবে? মেরে ফেলবে তোমাকে? হৃৎস্পন্দন থেমে রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যাবে? স্নায়ু—

ওটা একটা কথার কথা। জান শেষ হবে মানে মহা বিপদ। এই আংটিটা আমি

ঘুলঘুলির উপর লুকিয়ে রাখি। তুমি যেটুকু ব্যবহার করতে চাও ব্যবহার কর, তারপর ফিরিয়ে দিতে হবে ধরা পড়ার আগে।

ফিরিয়ে দিতে হবে কেন?

সোনার আংটি ফিরিয়ে দিতে হবে না? কতক্ষণ লাগবে তোমার?

তিন ঘন্টা তেত্রিশ মিনিট বারো সেকেন্ড।

এতক্ষণ লাগবে? খামচি মেরে একটু সোনা নিয়ে আংটিটা ফেরত দিতে পারবে না?

না। আমার মহাকাশযানের বৈদ্যুতিক যোগাযোগে অনেক বড় সমস্যা। এই জন্যে স্বর্ণ প্রয়োজন। বৈদ্যুতিক সুপরিবাহী মৌলিক পদার্থ। তিন ঘন্টা তেত্রিশ মিনিট বারো সেকেন্ড।

বল্টু বাইরে থেকে ডাকে, বিলু, ড্রাইভার এসে গেছে।

আমি চেয়ারে পা দিয়ে ঘুলঘুলির উপর সোনার আংটিটা রেখে বের হয়ে এলাম।

গাড়িতে ওঠার সময় শুনলাম ছোট খালা বলছেন, ড্রেসিং টেবিলের উপর আংটিটা রেখেছিলাম, কোথায় গেল?

আমি না শোনার ভান করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। মনে হয় আমার কপালে বড় দুঃখ আছে আজ!

বল্টু আর মিলিকে স্কুলে নামিয়ে দেবার পর ড্রাইভার আমাকে আমার স্কুলে নামিয়ে দেয়। আজকাল প্রায়ই আমি বল্টুর স্কুলে নেমে পড়ি, সেখান থেকে হেঁটে হেঁটে আমার স্কুলে আসি। ড্রাইভার বেশ খুশি হয়েই আমাকে নামিয়ে দেয়, সকালের ভিড় ঠেলে গাড়ি চালাতে তারও বেশি ভালো লাগে না মনে হয়। তা ছাড়া আমাকে নামিয়ে দিয়ে সে রাস্তা থেকে কিছু লোক তুলে একটা খেপ দিয়ে কিছু বাড়তি পয়সা বানিয়ে নেয়। হেঁটে হেঁটে স্কুলে যেতে আমার বেশ লাগে। কত রকম মানুষজন, কত রকম দোকানপাট দেখা যায়।

স্কুলে যাবার সময় কয়দিন থেকে আমার একটা আশ্চর্য অনুভূতি হচ্ছে। শুধু মনে হয় কেউ আমাকে অনুসরণ করছে। টুকুনজিলের সাথে ভাব হবার পর আজকাল অবশ্যি আর কিছুতেই বেশি অবাক হই না। সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে মহাকাশের এক আগন্তুক এই পৃথিবীতে এসে শুধু আমার সাথে যোগাযোগ করেছে, জিনিসটা চিন্তা করতেই আমার বুকের ভিতর কেমন জানি শিরশির করতে থাকে। ইস! কাউকে যদি বলা যেত, কী মজাটাই–না হত!

কিন্তু এই অনুসরণের ব্যাপারটা অন্যরকম। সাদা রঙের একটা মাইক্রোবাস আমি প্রায়ই দেখি। ড্রাইভারের পাশে একজন লাল রঙের বিদেশি বসে থাকে। আমার কেন জানি মনে হয় মাইক্রোবাসটা আমার পিছু পিছু যেতে থাকে। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমি যদি পিছনে ঘুরে তাকাই, মনে হয় মাইক্রোবাসটা থেমে যায় আর লাল রঙের মানুষটা চট করে আমার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। আমি কেমন জানি নিঃসন্দেহ হয়ে যাই যে টুকুনজিলের সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে কী করা যায় সেটা শুধু বুঝতে পারছিলাম না।

==

ক্লাসে এসে দেখি দেয়ালে একটা নূতন দেয়াল–পত্রিকা লাগানো হয়েছে। বিশেষ মহাকাশের প্রাণীসংখ্যা। বড় বড় করে লেখা ''সম্পাদক ঃ মুস্তাকিজুর রহমান লিটন।'' সেখানে মহাকাশের প্রাণী সম্পর্কে ভয়াবহ সমস্ত তথ্য দেয়া হয়েছে। বিদেশি ম্যাগাজিন থেকে মহাকাশের প্রাণীর কাল্পনিক ছবি কেটে লাগানো হয়েছে, সেইসব ছবি দেখলে পিলে চমকে যায়। একটা প্রাণীর তিনটে চোখ, আরেকটা প্রাণীর লকলকে লাল জিব, একজন মানুষকে ধরে চিবিয়ে খাচ্ছে, আরেকটা মাকড়সার মতো দুইটা পা দিয়ে ভয়ানক একটা অস্ত্র ধরে রেখেছে। সেখানেই শেষ হয় নি, মহাকাশের প্রাণী পৃথিবীতে এসে কী–রকম ভয়ানক তাণ্ডবলীলা শুরু করবে, সেটার বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া আছে। সেই প্রাণী থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কি কি সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে, সেটাও লিটন অনেক খেটে–খুঁটে লিখেছে।

স্যার ক্লাসে এসে দেয়াল–পত্রিকা দেখে চুপ মেরে গেলেন। লিটন খুব আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন হয়েছে, স্যার?

স্যার অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, ভালো হয়েছে।

আমেরিকায় ভয়ের একটি পত্রিকা বের হয়, সেখান থেকে ছবিগুলো নিয়েছি।

বেশ বেশ।

সম্পাদকীয়টা পড়েছেন, স্যার?

পড়েছি।

কেমন হয়েছে, স্যার?

ভালোই হয়েছে—তবে তুই ধরে নিয়েছিস মহাকাশের প্রাণী হবে খুব ভয়ঙ্কর। সেটা তো না–ও হতে পারে।

কিন্তু স্যার, আমি একটা সিনেমা দেখেছি, সেখানে দেখিয়েছে—

ধুর। সিনেমা তো সবসময়ে গাঁজাখুরি হয়।

স্যার ক্লাসে পড়ানো শুরু করলেন। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ থেমে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ। তারপর ঘুরে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা সবাই আর্কিমিডিসের সূত্র জানিস?

দেখা গেল সবাই জানে না। স্যার তখন বেশ সময় নিয়ে আমাদের আর্কিমিডিসের সূত্রটা বুঝিয়ে দিলেন। আর্কিমিডিস প্রথম যখন সূত্রটা ভেবে বের করেছিলেন, তখন যে ন্যাংটো হয়ে রাস্তায় ছুটতে শুরু করেছিলেন, সেই গল্পটাও বললেন। গল্পটা আগেই জানতাম, কিন্তু ন্যাংটো হয়ে গোসল করার দরকারটা কী ছিল, সেটা কখনোই আমি বুঝতে পারি নি।

আর্কিমিডিসের সূত্রটা বুঝিয়ে দিয়ে স্যার বললেন, এবার তাহলে তোদের একটা প্রশ্ন করি, তোরা তার ঠিক উত্তর ভেবে বের করতে পারিস কি না দেখি। এক সপ্তাহ সময় দেব। একটা বড় চৌবাচ্চার মাঝে একটা নৌকা ভাসছে, সেই নৌকায় তুই বসে আছিস। নৌকায় তোর সাথে আছে একটা বড় পাথর। চৌবাচ্চাটা একেবারে কানায় কানায় ভরা। এখন তুই পাথরটা নৌকা থেকে তুলে চৌবাচ্চার মাঝে ছেড়ে দিলি। পানি কি চৌবাচ্চা থেকে উপচে পড়বে? একই থাকবে? নাকি পানির লেভেল একটু কমে

যাবে?

স্যার একটু হেসে বললেন, যদি উত্তরটা ভেবে বের করতে না পারিস, মন-খারাপ করিস না, অনেক বাঘা-বাঘা প্রফেসররাও পারে নি।

উত্তরটা ভেবে বের করার জন্যে স্যার এক সপ্তাহ সময় দিয়েছেন, কিন্তু আমি তখন তখনই ভুরু কুঁচকে ভাবতে শুরু করলাম। এ ধরনের সমস্যা নিয়ে ভাবতে আমার খুব ভালো লাগে। স্যার ক্লাসে আবার পড়ানো শুরু করেছেন, কিন্তু আমি আর মন দিতে পারছি না। ঘুরেফিরে শুধু মনে পড়ছে একটা ভরা চৌবাচ্চায় একটা নৌকা—নৌকার মাঝে আমি বসে আছি পাথরটা নিয়ে।

উত্তরটা কি হবে আমি প্রায় সাথে সাথেই বের করে ফেললাম। আর্কিমিডিস যখন তাঁর সূত্র বের করেছিলেন তখন তার যেরকম আনন্দ হয়েছিল, আমার প্রায় ঠিক সেরকম আনন্দ হল, লাফিয়ে উঠে হাত তুলে বললাম, আমি বলব স্যার, আমি বলব-

স্যার অবাক হয়ে বললেন, কি বলবি?

চৌবাচ্চার পানির লেভেল বাড়বে না, কমবে—

স্যার চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকালেন। অবাক হয়ে বললেন, তুই উত্তরটা বের করে ফেলেছিস!

জ্বি স্যার—আমি উত্তেজনায় ঠিক করে কথা বলতে পারছিলাম না, হড়বড় করে কোনোমতে উত্তরটা বললাম।

স্যার অবাক হয়ে আমার উত্তরটা শুনলেন, তার মুখে একটা আশ্চর্য হাসি ফুটে উঠল, তারপর হেঁটে এসে আমার পিঠে থাবা দিয়ে বললেন, ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড। ভেরি ভেরি ভেরি গুড। আমার একজন প্রফেসর বন্ধু আছে, কলেজে ফিজিক্স পড়ায়, সেও পর্যন্ত এর ঠিক উত্তর দিতে পারে নি। তুই দিয়ে দিলি—

খুশিতে আমার চোখে একেবারে পানি এসে গেল। স্যার বললেন, বিলু, আজ থেকে তুই হলি ক্লাস ক্যাপ্টেন।

আমি লিটনের দিকে তাকালাম, তার মুখ ছাইয়ের মতো সাদা, মনে হচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। হিংসে কার না হয়? সবারই হয়, কিন্তু সেটা চেহারায় প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেয়াটা তো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। লিটন ক্লাসের ফার্স্ট বয় এবং ক্লাস ক্যাপ্টেন। সে দেয়াল-পত্রিকার সম্পাদক এবং ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন। সবকিছুতেই সে আছে, ফার্স্ট বয়রা যেটা খুশি সেটা করতে পারে। কিন্তু আজ তার ক্লাস ক্যাপ্টেনের দায়িত্বটা নিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছে আমাকে, ক্লাসে সবার সামনে, আনন্দে আমার বুকটা ভরে গেল! কিন্তু আমি লিটনের মতো এত বোকা নই, তাই মহানুভব মানুষের মতো বললাম, স্যার, আমি ক্লাস ক্যাপ্টেন হতে চাই না, স্যার।

কেন?

ক্লাস ক্যাপ্টেনদের সবার উপর সর্দারি করতে হয় বলে কেউ তাকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

সর্দারি?

জ্বি স্যার, ক্লাসে দুষ্টুমি করলে নাম লিখে স্যারদের কাছে নালিশ করতে হয়—খুব খারাপ কাজ স্যার।

==

স্যার মনে হয় খুব অবাক হলেন শুনে, ক্লাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিলু কি ঠিক বলছে?

সবাই মাথা নাড়ল, ঠিক স্যার, একেবারে ঠিক।

আমি বললাম, স্যার, নিয়ম করে দেন একেক সপ্তাহে একেকজন ক্লাস ক্যাপ্টেন হবে। তাহলে ক্যাপ্টেন আর মিছেমিছি নাম লিখবে না, কারণ যার নাম মিছেমিছি লিখবে, সে যখন ক্যাপ্টেন হবে সে শোধ নেবে—

মিছেমিছি? মিছেমিছি কি নাম লেখা হয়?

সবসময় হয় না স্যার, মাঝে মাঝে হয়। কারো কারো নাম বেশি লেখা হয়, কারো কারো নাম কম লেখা হয়—

সত্যি?

পুরো ক্লাস আবার মাথা নাড়ল, লিটন ছাড়া। সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

স্যার খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্লাসের মাঝখানে, তারপর বললেন, ঠিক আছে আজ থেকে তাই নিয়ম। একেক সপ্তাহে একেকজন ক্লাস ক্যাপ্টেন।

ক্লাসের সবাই একটা আনন্দের মতো শব্দ করল। আমার বুকটা মনে হল দশ হাত ফুলে গেল সাথে সাথে।

ঘন্টা পড়ার পর স্যার ক্লাস থেকে বের হয়ে যাবার পর ভেবেছিলাম লিটন চোখ লাল করে আমার কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু সে মুখ গোঁজ করে নিজের জায়গায় বসে রইল। তারিক আমার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, তুই মহা ফিঞ্চুরাস মানুষ।

ফিঞ্চুরাস? সেটা মানে কি?

যার মাথায় ফিচলে বুদ্ধি এবং যে হচ্ছে ডেঞ্জারাস, সে হচ্ছে ফিঞ্চুরাস। কী সুন্দর লিটনের মাথাটা ক্লাসের সামনে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলি।

পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলাম?

হ্যাঁ, যখন চৌবাচ্চার উত্তরটা দিলি, মনে হল হিংসায় লিটনের একেবারে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।

তারিককে পুরো ব্যাপারটা নিয়ে খুব খুশি দেখা গেল। গলা নামিয়ে বলল, আমাদের ব্ল্যাক মার্ডার দলের মেম্বার হবি?

কী করতে হবে?

আঙুল থেকে এক ফোঁটা রক্ত দিয়ে রক্ত শপথ করতে হবে।

ঠিক আছে। কখন?

পরশুদিন ব্ল্যাক মার্ডারের মিটিং।

কোথায়?

স্কুলে।

স্কুলে? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, পরশুদিন ছুটি না?

তারিক গম্ভীর হয়ে হাসে। স্যার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, মিটিং করার জন্যে ক্লাসঘর খুলে দেয় কালীপদ। স্যার আর কালীপদ তাই আমাদের ব্ল্যাক মার্ডার দলের বিশেষ সদস্য।

শুনে আমি চমৎকৃত হলাম।

দুপুরে সুব্রত জানাল, তার কাছে ''চকিত হিয়া'' নামে একটা বড়দের উপন্যাস আছে, আমি পড়তে চাইলে নিতে পারি। বড়দের উপন্যাস পড়তে আমার খুব ভালো লাগে, খুশি হয়ে নিলাম আমি। নান্টু জিজ্ঞেস করল, তার জুপিটার ফুটবল ক্লাবে সেন্টার ফরোয়ার্ডের একটা জায়গা খালি আছে, আমি খেলতে চাই কি না—আমি খুব খুশি হয়ে রাজি হলাম। মাহবুব জিজ্ঞেস করল, সে একটা টেলিস্কোপ তৈরি করছে, আমি তার সাথে সেটা নিয়ে গবেষণা করতে চাই কি না। আমি আগে কখনো গবেষণা করি নি, কিন্তু মাহবুব যদি করতে পারে আমিও নিশ্চয়ই পারব, তাই রাজি হয়ে গেলাম। মোট কথা, হঠাৎ করে ক্লাসে আমার অনেক বন্ধু হয়ে গেল।

১০. বিপদ

বাসায় এসে দেখি সারা বাসা থমথম করছে। বল্টু আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল, আজ তোমাকে ধোলাই দেয়া হবে।

আমাকে? আমি ঢোক গিলে বললাম, কেন?

তুমি আম্মার আংটি চুরি করেছ।

আমি চমকে উঠলাম। কী সর্বনাশ! ধরা পড়ে গেছি? জোর করে অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, আমি!

হ্যাঁ। চুরি করে তোমার বিছানার নিচে রেখেছ।

বিছানার নিচে? আমি একটু অবাক হলাম, ঘুলঘুলির উপর রেখে গিয়েছিলাম, বিছানার নিচে কেমন করে এল?

বল্টু হাতে কিল দিয়ে বলল, আজকে তোমাকে রাম-ধোলাই দেবে। আম্মা বলেছে, তোমরা চোরের গুষ্টি।

ইচ্ছে হল বল্টুর মাথাটা ধড় থেকে ছিঁড়ে আলাদা করে ফেলি, কিন্তু সেটা তো ইচ্ছে করলেই করা যায় না। নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে আমি ডাকলাম, টুকুনজিল।

কোনো সাড়া নেই। আমি আবার ডাকলাম, টুকুনজিল—তুমি কোথায়?

তবু কোনো সাড়া নেই। তাহলে কি চলে গেছে? কিন্তু একবার আমাকে বলে যাবে না? সোনা দিয়ে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ঠিক করার পর তার মহাকাশযান গতিবেগ ফিরে পেয়েছে, আর কোনো সমস্যা নেই, তাই আর দেরি করে নি। পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। আমার বিশ্বাস হতে চাইল না, আবার ডাকলাম, টুকুনজিল।

তবু কোনো সাড়া নেই।

টুকুনজিল থাকলে আর কোনো সমস্যা ছিল না—এত বড় একটা ব্যাপারের সামনে সোনার আংটি একটা তুচ্ছ জিনিস। কিন্তু টুকুনজিল যদি ফিরে চলে গিয়ে থাকে, তা হলে টুকুনজিলের কথা মুখে আনা মানে নিজেকে পাগল প্রমাণ করা। আগেরবার তো শুধু ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন—এবারে নিশ্চয়ই ধরে একেবারে পাগলা-গারদে

==

দিয়ে আসবেন।

বিছানার নিচে সোনার আংটিটা পাওয়া গেছে। এখন সবাইকে বোঝাব কেমন করে? যদি টুকুনজিল ফিরে না আসে তাহলে বলা যায় ছোট খালার বাসায় থাকা আমার শেষ হয়ে গেল। ভালোই হল হয়তো, খামোকা মা-বাবা ভাই-বোন সবাইকে ছেড়ে এখানে পড়ে আছি। এখানে আসার পর থেকে কতরকম যন্ত্রণা! কিন্তু মা মনে বড় কষ্ট পাবেন। ভিন্ন গ্রহের এক প্রাণী যেন তার মহাকাশযান সারাতে পারে, সেজন্যে সোনার আংটি চুরি করেছি কথাটা কাউকেই বিশ্বাস করানো সম্ভব না। বাবা হয়তো বিশ্বাস করবেন, কিন্তু বাবা বিশ্বাস করলেই কী আর না করলেই কী?

আমার মনটা এত খারাপ হল যে বলার নয়, ইচ্ছে হল ডাক ছেড়ে কাঁদি, কিন্তু কেঁদে লাভ কি?

খাবার টেবিলে কেউ কোনো কথা বলল না। খালু অবশ্যি এমনিতেই বেশি কথা বলেন না, ছোট খালা সেটা পুষিয়ে নেন। আজ ছোট খালা একটিবার মুখ খুললেন না। সাধারণত বল্টু আর মিলি বেশ বকরবকর করে, আজ মনে হয় ভয়ের চোটে তারাও বেশি কথা বলছে না। বল্টুর মুখে অবশ্যি সারাক্ষণই একটা আনন্দের হাসি লেগে রইল, আমাকে ধোলাই দেয়া হবে, এর মাঝে বল্টু যদি আনন্দ না পায়, তাহলে কে আনন্দ পাবে?

পুরো খাওয়াটা কোনো রকম কথাবার্তা ছাড়াই শেষ হয়ে যেত, কিন্তু এর মাঝে টেলিফোন এল। ছোট খালু টেলিফোনে খানিকক্ষণ কথা বলে আবার খেতে বসলেন, টেলিফোন করেছেন ডাক্তার চাচা, কিছু-একটা অস্বাভাবিক জিনিস ঘটেছে তাঁর চেম্বারে। ছোট খালু নিজে থেকে না বললে জানার উপায় নেই, আমার আজকে জিজ্ঞেস করার সাহস হচ্ছে না। ছোট খালা জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে কামরুলের চেম্বারে।

চুরি।

কী চুরি হয়েছে?

এখনো ধরতে পারছে না। কিছু ফাইল। বিলুর ফাইলটাও।

ফাইল দিয়ে কী করবে চোর?

সেটাই তো কথা।

কেমন করে চুরি হল?

বুঝতে পারছে না, দরজা-জানালা কিছু ভাঙে নি, কী ভাবে ভিতরে ঢুকে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার!

এইটুকু কথা বলার পর আবার সবাই চুপ করে গেল। ইলিশ মাছের ডিম রান্না হয়েছে আজকে, আমার খুব ভালো লাগে ইলিশ মাছের ডিম খেতে, কিন্তু আজ আর খাওয়ায় কোনো আনন্দ নেই।

খাওয়া শেষ হবার পর খালু বললেন, বল্টু আর মিলি, তোমরা তোমাদের ঘরে যাও।

বল্টু বলল, আমরা থাকি, আব্বা?

ছোট খালু গম্ভীর গলায় বললেন, না।

বল্টু আর মিলি উঠে নিজের ঘরে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা

করতে লাগল। খালু চেয়ারে হেলান দিয়ে মেঘস্বরে বললেন, বিলু, তোমার সাথে কিছু জরুরি কথা আছে।

কথাটা কি আমার আর বুঝতে বাকি থাকে না, তবু আমি মুখে একটা কৌতূহলের ভাব ফোটানোর চেষ্টা করি, কি কথা, খালু?

তোমার ছোট খালার একটা আংটি আজ সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা তোমার ঘরে পাওয়া গেছে।

আমার ঘরে? আমি খুব অবাক হবার ভান করলাম, কোথায়?

ছোট খালা বললেন, তোর বিছানার নিচে।

বিছানার নিচে? কী আশ্চর্য! আমি তখনো অবাক হবার ভান করতে থাকি। জিনিসটা খুব সোজা নয়।

খালু আবার মেঘস্বরে বললেন, আংটিটা কেমন করে তোমার ঘরে গেল বোঝাতে পারবে?

আমি কী আর বলব? টুকুনজিল থাকলে পারতাম, কিন্তু সে চলে গেছে, এখন আমি কেমন করে বোঝাব? আমি মাথা নাড়লাম, পারব না।

ছোট খালা সরু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবারে হঠাৎ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন, চিৎকার করে বললেন, তোকে এখানে আনাই ভুল হয়েছে। ছোটলোকের জাত। প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে গুণ্ডার মতো মারপিট করে এসেছিস। এই বয়সে সিগারেট খাওয়া শিখেছিস। এতেই শেষ হয় নি, এখন চুরি করা শিখেছিস। কতদিন থেকে চুরি করছিস কে জানে। ছোটলোকের জাত, কোনদিন বাসায় কার গলায় ছুরি চালিয়ে দিবি—

ছোট খালার কথা শুনে আমার মাথায় একেবারে আগুন ধরে গেল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম। খালু বললেন, আহ্ শানু, তুমি কী বলছ এইসব?

ছোট খালা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে এক পাক ঘুরে আঙুল থেকে আংটিটা খুলে খাবার টেবিলের উপর ছুড়ে দিয়ে বললেন, এই আংটিটার কি পা আছে? নিজে নিজে হেঁটে গেছে বিলুর ঘরে? হেঁটে হেঁটে গেছে?

এরপর যে-জিনিসটা ঘটল তার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ করে আংটিটা ছোট একটা লাফ দিল টেবিলের উপর। তারপর ঠিক মানুষের হাঁটার ভঙ্গিতে টেবিলের উপর হেঁটে বেড়াতে শুরু করল। ছোট খালার কাছাকাছি এসে আবার ছোট ছোট দু'টি লাফ দিল আংটিটা।

ছোট খালা একটা চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে পিছনে সরে এলেন। খালু দাঁড়াতে গিয়ে তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোমতে টেবিল ধরে সামলে নিলেন। আমিও একটা চিৎকার দিচ্ছিলাম, হঠাৎ বুঝে গেলাম কী হয়েছে। টুকুনজিল এসেছে! টুকুনজিল!!

ছোট খালা ঢোক গিলে বললেন, কী হচ্ছে এটা? কী হচ্ছে?

তার কথা শুনেই কি না জানি না, আংটিটা আবার হেঁটে বেড়াতে শুরু করল। আমি অনেক কষ্ট করে হাসি চেপে বললাম, দেখেছ ছোট খালা? দেখেছ? এই আংটিটা নিজে নিজে হেঁটে যেখানে খুশি চলে যায়!

কেন? কেন যাচ্ছে? হায় আল্লাহ্!

খালু আংটিটা ধরার চেষ্টা করলেন, ধরতে পারলেন না, হাত ফসকে আংটিটা

==

একটা লাফ দিয়ে ডালের বাটিতে ডুবে গেল।

ঠিক তখন একটা আলোর ঝলকানি দেখলাম, সাথে সাথে ছোট খালা একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার দিলেন।

খালু ছোট খালার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে, শানু? কি হয়েছে?

ছোট খালা কাঁপতে কাঁপতে তাঁর হাতটি মেলে ধরলেন, বল্টু আর মিলিও ছুটে এসেছে তাদের ঘর থেকে। সবাই মিলে দেখল—হাতের উল্টো পিঠে ছোট গোল পোড়া দাগ।

বল্টু শুকনো মুখে বলল, সিগারেটের ছ্যাঁকা। ঠিক বিলুর মতো।

ছোট খালা প্রায় কাঁদতে শুরু করলেন। বললেন, এক্ষুণি হল। এইমাত্র—এইমাত্র কে জানি ছ্যাঁকা দিল।

হঠাৎ করে ছোট খালা আমার দিকে ঘুরে তাকালেন, আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই বিলু—বিলু সব জানে। জিনের আছর আছে। আমি শুনেছি সারা রাত জিনের সাথে কথা বলে।

খালু ছোট খালার হাত ধরে বললেন, আহ্! কী আজেবাজে কথা বলছ!

ছোট খালার হিস্টিরিয়ার মতো হয়ে গেল, চিৎকার করে বললেন, বাজে কথা বলছি আমি? বাজে কথা? ওর চোখের দিকে তাকাও, দেখেছ কী রকম দৃষ্টি? ওটা কি মানুষের দৃষ্টি? হায় আল্লাহ্, আমি কী সর্বনাশ করেছি! নিজের ঘরে শয়তান ডেকে এনেছি। বাণ মেরে দিচ্ছে, যাদু করে দিচ্ছে সবাইকে—ছেলেপুলের সংসার আমার তছনছ করে দিচ্ছে—

আমি কিছু-একটা বলার চেষ্টা করলাম, খালু ধমক দিয়ে বললেন, যাও, তোমার ঘরে যাও।

আমি আমার ঘরে বসে শুনতে পেলাম ছোট খালা হাউ হাউ করে কাঁদছেন। কী যন্ত্রণা!

ফিসফিস করে বললাম, টুকুনজিল।

কি হল?

তুমি কোথায় গিয়েছিলে? ডেকে পাচ্ছিলাম না।

ইঞ্জিনটা ঠিক হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখলাম।

ঠিক হয়েছে?

নিরানব্বই দশমিক নয় নয় নয় নয় নয় নয় নয় ভাগ।

তা হলে তো ঠিকই হয়ে গেছে।

সোনাতে ভেজাল মিশানো ছিল, আলাদা করি নি। তাই অল্পকিছু গোলমাল আছে।

কোথায় গিয়েছিলে?

চতুর্থ গ্রহ। দ্বিতীয় চন্দ্র।

আমি অবাক হয়ে বললাম, মঙ্গল গ্রহে? মঙ্গল গ্রহের চাঁদে?

হ্যাঁ।

এত তাড়াতাড়ি আবার ঘুরে চলে এসেছ! এত তাড়াতাড়ি?

আমি খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারি।

কী মজা! তুমি এখন তোমার দেশে ফিরে যেতে পারবে?

পারব।

কবে যাবে?

সময় সংকোচনের প্রথম প্রবাহের দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল তরঙ্গের পর।

সেটা কবে?

শুরু হয়ে গেছে।

আমি চমকে উঠে বললাম, তার মানে তুমি চলে যাবে?

হ্যাঁ। কালকে যাওয়া সবচেয়ে সুবিধে। পরশুদিন বেশ কষ্ট হবে। তার পরের দিন খুব কঠিন, সাফল্যের সম্ভাবনা চার দশমিক তিন। তার পরের দিন সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি।

তুমি চলে যাবে।

টুকুনজিল কোনো উত্তর দিল না। একটু পরে বলল, তোমার মস্তিষ্কে অবতরঙ্গ তৈরি হচ্ছে, মূল তরঙ্গের পাশে দুটি ছোট তরঙ্গ—কেন এটা হচ্ছে?

তুমি চলে যাবে, তাই আমার মন-খারাপ হচ্ছে।

মন খারাপ? মন খারাপ মানে কি?

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, তুমি মন খারাপ মানে জান না? তোমার কখনো মন খারাপ হয় না?

না। সেটা কেমন করে হয়?

আমি একটু মাথা চুলকালাম, যার কখনো মন খারাপ হয় না, তাকে কেমন করে বোঝাব মন খারাপ কী জিনিস? একটু ভেবে বললাম, মন খারাপ হচ্ছে মন ভালো হওয়ার উল্টোটা। হাসিখুশির উল্টো হচ্ছে মন খারাপ।

হাসিখুশি? সেটা কি?

তুমি হাসিও জান না? আমি খুকখুক করে হেসে ফেললাম শুনে।

তুমি কী করলে এটা?

আমি একটু হাসলাম।

হাসলে এরকম শব্দ করতে হয়?

হ্যাঁ, একেকজন মানুষ একেক রকমভাবে হাসে। কেউ হাঃ হাঃ করে শব্দ করে, কেউ হোঃ হোঃ করে শব্দ করে, কেউ খিকখিক শব্দ করে—

সম্পূর্ণ যুক্তিবহির্ভূত ব্যাপার। তুমি আবার হাস দেখি।

এমনি, এমনি কেমন করে হাসব, একটা হাসির ব্যাপার হলেই শুধু হাসা যায়।

অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার। মানুষের মাঝে অনেক কিছু শেখার আছে। হাসি। মন খারাপ। আর কী আছে তোমাদের?

আমি মাথা চুলকালাম, বললাম, ভয় বলে আরেকটা জিনিস আছে।

ভয়?

হ্যাঁ ভয়।

একটু ভয় পাও দেখি।

আমি আবার খুকখুক করে হেসে বললাম, খামোকা আমি ভয় পাব কেমন করে? একটা ভয়ের জিনিস হোক, তখন—

===

সেটা কী রকম?

আমি আবার মাথা চুলকালাম, অনেক যখন বিপদ হয় তখন ভয় পায় মানুষ।

সত্যি?

হ্যাঁ। তোমার যখন বিপদ হয়েছিল, তুমি ভয় পেয়েছিলে না?

না। আমাদের কোনো অনুভূতি নেই। আমাদের হচ্ছে যুক্তি–তর্ক আর হিসেব। চুলচেরা হিসেব।

তোমাদের কোনো অনুভূতি নেই? রাগ–দুঃখ, ভয়–ভালবাসা কিছু নেই?

না।

ভারি আশ্চর্য।

টুকুনজিল বলল, তুমি আমাকে শেখাবে?

তুমি যদি শিখতে চাও, শেখাব। আগে থেকে বলে রাখি, তোমার কিন্তু লাভ থেকে ক্ষতিই বেশি হবে।

আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাসার সামনে দু'টি মাইক্রোবাস দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু মনে হয় ভিতরে কেউ বসে আছে। শুধু মনে হয় বসে বসে এদিকে তাকিয়ে আছে। কিছু–একটা ব্যাপার আছে এর ভিতরে। সবাইকে এখন বলে দেয়ার সময় হয়েছে, তাহলে আর আমার কোনো দায়িত্ব থাকবে না। আমি ডাকলাম, টুকুনজিল।

বল।

আমি কি এখন তোমার কথা সবাইকে বলতে পারি?

পার। কাকে বলবে তুমি?

আমার ডাক্তার চাচাকে বলেছিলাম, বিশ্বাস করেন নি। মনে করেছিলেন, আমি পাগল। আমি একটু হাসলাম—

টুকুনজিল বলল, তুমি হাসলে এখন, তার মানে এটা হাসির ব্যাপার?

হ্যাঁ। বুঝতে পারলে, কেন এটা হাসির ব্যাপার?

এখনো বুঝি নি। ঠিক আছে বল, কাকে বলবে?

আমার স্যারকে। স্যার আমার কথা বিশ্বাস করবেন। তুমি কি সেই আংটির খেলাটা দেখাতে পারবে? ক্লাসের সবাইকে।

পারব। তুমি যদি চাও, তা হলে তোমাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখব সবার সামনে।

পারবে তুমি? পারবে?

পারব। খুব সহজ। আমার ইঞ্জিনের এখন অনেক শক্তি।

আমি খুশিতে একেবারে হেসে ফেললাম।

টুকুনজিল বলল, আবার হাসলে তুমি। এটা হাসির ব্যাপার? এটা হাসির ব্যাপার?

অনেক কথা হল আমার টুকুনজিলের সাথে। প্রথম যখন দেখা হয়েছিল, একেবারে ভালো করে কথা বলতে পারত না, একটা কথা বলত এক শ' বার, এখন প্রায় মানুষের মতো কথা বলতে শিখে গিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, তার হাসতে শেখার চেষ্টা। মাঝে–মাঝেই হাসার মতো শব্দ করে—বেশির ভাগ সময়েই ভুল জায়গায়। আমি তাকে শুধরে দিচ্ছি, কে জানে, তার গ্রহে ফিরে যাবার আগে সে হয়তো হাসতে শিখে যাবে।

১১. ছিনতাই

আজকেও আমি বল্টুর স্কুলে নেমে হেঁটে হেঁটে আসছিলাম। ক্লাসে আজকে কী মজা হবে চিন্তা করে আমার মুখের হাসি বন্ধ হচ্ছিল না। ক্লাস শুরু হওয়ার পরই আমি হাত তুলে বলব, স্যার, একটা কথা বলতে পারি?

স্যার বলবেন, কি কথা?

আমি বলব, খুব জরুরী কথা।

স্যার বলবেন, বল।

ঠিক তখন টুকুনজিল আমাকে বেঞ্চের উপর দিয়ে শূন্যে ভাসিয়ে নিয়ে আসবে, স্যারের সামনে; এনে মেঝে থেকে এক হাত উপরে ঝুলিয়ে রাখবে। স্যার নিশ্চয়ই এত অবাক হবেন যে কথা পর্যন্ত বলতে পারবেন না। আমি তখন বলব, স্যার, আপনার সাথে আমার বন্ধু টুকুনজিলের পরিচয় করিয়ে দিই।

স্যার বলবেন, টুকুনজিল?

আমি তখন বলব, জ্বি স্যার, মহাকাশের প্রাণী টুকুনজিল। তাকে দেখা খুব শক্ত, ম্যাগনিফাইং গ্লাস ছাড়া দেখা যায় না—

ঠিক এরকম সময়ে কে যেন আমার ঘাড়ে টোকা দিল। আমি চমকে পিছনে তাকালাম। খুব ভালো কাপড় পরা একজন মানুষ। সামনে চুল একটু পাতলা হয়ে এসেছে, চোখে চশমা। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে, খোকা, শোন—

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ, তুমি একটু এদিকে আসবে?

এখন তো আমার স্কুলে যাবার সময়।

এক মিনিট—

আমি হঠাৎ টের পেলাম, আমার দুই পাশে আরো দুইজন মানুষ আমার দুই হাত শক্ত করে ধরেছে। মানুষগুলো ভালো কাপড়-পরা, মুখ কেমন যেন হাসি হাসি, কেউ দেখলে ভাববে আমার পরিচিত কোনো মানুষ কিছু-একটা মজার কথা বলবে আমার সাথে। কিন্তু আমার বুঝতে বাকি থাকে না, এর মাঝে মজার কিছু নেই। লোক দু'জন আমাকে প্রায় শূন্যে ঝুলিয়ে নিয়ে যায়। কাছেই সেই মাইক্রোবাসটা দাঁড়িয়ে আছে, কাছাকাছি আসতেই দরজাটা খুলে গেল আর দুই জোড়া শক্ত হাত আমাকে ভিতরে টেনে নিল। পুরো ব্যাপারটা ঘটল চোখের পলকে, আমি কিছু বোঝার আগে।

মাইক্রোবাসের জানালা টেনে তুলে রাখা, বাইরে থেকে দেখার উপায় নেই। ভিতরে সব কয়জন বিদেশি, লাল রঙের চেহারা দেখলেই পিলে চমকে যায়। একজন হলুদ দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করে বলল, কুকা, টোমাড় কুনু বয় নায়—যার অর্থ নিশ্চয়ই খোকা, তোমার কোনো ভয় নেই।

আমি গলা ফাটিয়ে একটা চিৎকার দিতে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখন হাতের কনুইয়ের কাছে একটা খোঁচা লাগল, হাতটা সরানোর চেষ্টা করতেই দেখলাম কেউ-একজন শক্ত করে ধরে রেখেছে। মাথা ঘোরাতেই দেখলাম, একটা সিরিঞ্জে করে কী-একটা ইনজেকশান দিচ্ছে আমাকে।

প্রচণ্ড ভয়ে আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু তার আগেই হলুদ-

==

দাঁতের লোকটা আমার মুখ চেপে ধরে বলল, কুকা, কুনু বয় নায়।

আমার গলা দিয়ে বিশেষ শব্দ বের হল না, যেটুকু বের হল, মাইক্রোবাসের ইঞ্জিনের শব্দে চাপা পড়ে গেল তার বেশির ভাগ। আরেকটা চিৎকার দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শরীরে জোর পাই না আমি, হঠাৎ করে আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। নিশ্চয়ই আমাকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছে। চোখ বন্ধ করার আগে দেখতে পেলাম, হলুদ-দাঁতের লালমুখো বিদেশিটা আমার উপর ঝুঁকে মুখে হাসির ভঙ্গি করে রেখেছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি অনেক রকম স্বপ্ন দেখলাম। ছাড়া-ছাড়া আজগুবি সব স্বপ্ন। এক সময় স্বপ্নে দেখলাম আমি বাড়ি ফিরে গেছি, বাবা একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে এমন একটা ভঙ্গি করলেন, যেন আমাকে দেখতেই পান নি। আমি ডাকলাম, বাবা।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, কে কথা বলে?

আমি বললাম, আমি।

আমি কে?

আমি বিলু।

বিলু?

হ্যাঁ।

বাবা আকুল হয়ে বললেন, তুই কোথায় বাবা বিলু?

আমি বললাম, এই তো, বাবা।

বাবা মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকালেন কিন্তু তবু আমাকে দেখতে পেলেন না। বললেন, কোথায় তুই? কোথায়? তোকে দেখতে পাই না কেন?

আমি বললাম, এই তো বাবা,আমি এখানে।

কোথায়?

এই তো! বাবা, বাবা—

বিলু বিলু বিলু—

আমার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, কেউ-একজন সত্যি আমাকে ডাকছে। আমি আস্তে আস্তে চোখ খুললাম, উজ্জ্বল আলো ঘরে, তার মাঝে একজন আমার মুখের উপর ঝুঁকে আছে। আগে কোথায় জানি দেখেছি লোকটাকে, কিন্তু মনে করতে পারলাম না।

আমার হঠাৎ করে সব মনে পড়ে গেল। স্কুলে যাচ্ছিলাম আমি, তখন রাস্তা থেকে ধরে এনেছে আমাকে, আমি উঠে বসার চেষ্টা করলাম। মাথার কোথায় জানি প্রচণ্ড যন্ত্রণা করে উঠল হঠাৎ। মনে হচ্ছে ভিতরে একটা শিরা ছিঁড়ে গেছে বা অন্য কিছু। আমার সামনে দাঁড়ানো লোকটা অন্তরঙ্গ সুরে বলল, কেমন লাগছে বিলু তোমার?

কথা শুনে মনে হল যেন আমার কতদিনের পরিচিত। আমি জিব দিয়ে আমার শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে বললাম, খারাপ। খুব খারাপ।

এই তো এক্ষুণি ভালো লাগবে তোমার।

আপনি কে? আমি কোথায়?

এক্ষুণি জানবে তুমি, আমি কে। নাও, এই ওষুধটা খেয়ে নাও।

ছোট একটা গ্লাসে করে লাল রঙের একটা ওষুধ আমার মুখের কাছে ধরল মানুষটা। আমি মাথা নাড়লাম, কি–না–কি খাইয়ে দিচ্ছে কে জানে।

খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, ভালো লাগবে—বলে প্রায় জোর করে ওষুধটা আমার মুখের মাঝে ঢেলে দিল। ওষুধটা মিষ্টি এবং চমৎকার একটা সুগন্ধ, তবু আমি খেলাম না, মুখে রেখে দিলাম। লোকটা আবার কাছে আসতেই আমি পিচকারির মতো তার মুখে ওষুধটা কুলি করে দিলাম—মানুষটাকে চিনতে পেরেছি, আজ সকালে সে আমাকে ধরে এনেছে।

লাল ওষুধটা তার চশমা বেয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। দেখতে দেখতে তার চমৎকার কাপড়ে লাল লাল ছোপ হয়ে যায়।

ঠা ঠা করে কে যেন হেসে উঠল হঠাৎ, আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম, লালমুখের আরেকজন বিদেশি মানুষ। আগে একে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। কে জানে, হয়তো দেখেছি, এদের সবগুলোকে একই রকম দেখায়।

ভালো কাপড়–পরা মানুষটি তার লাল লাল ছোপ কাপড় নিয়ে আমার দিকে হিংস্র চোখে তাকাল। আমি একেবারে লিখে দিতে পারি, ঘরে আর কেউ না থাকলে আমাকে মেরে বসত। কিন্তু আমি জানি আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না। সারা পৃথিবীতে শুধু আমিই টুকুনজিলের খোঁজ জানি, এই লোকগুলো সে জন্যেই আমাকে ধরে এনেছে।

বিদেশি লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে হড়বড় করে কী যেন বলল, আমি তার একটা অক্ষরও বুঝতে পারলাম না। নিশ্চয়ই ইংরেজিই হবে, কিন্তু এটা কী রকম ইংরেজি!

একটা রুমাল দিয়ে মুখ কপাল এবং ঘাড় মুছতে মুছতে ভালো কাপড়–পরা মানুষটি বলল, এই সাহেব বলছেন যে তোমার অনেক বড় বিপদ ছিল, সেটা কি তুমি জানতে?

কি বিপদ?

একটা প্রাণী তোমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, অনেক কষ্ট করে তোমাকে রক্ষা করা হয়েছে।

কোন প্রাণী?

মহাকাশের প্রাণী।

আমাকে ধরে নিতে এসেছিল?

হ্যাঁ।

রাগে আমার পিত্তি জ্বলে গেল, বললাম, মিথ্যুক—আপনার লজ্জা করে না এরকম মিথ্যা কথা বলতে? আমাকে মহাকাশের প্রাণী ধরে আনে নি, আপনারা ধরে এনেছেন। বিদেশি দালাল।

বিদেশি লোকটা তখন ভালো কাপড়–পরা মানুষটির সাথে খানিকক্ষণ কথা বলল। আমি ইংরেজি একটু একটু বুঝতে পারি, কিন্তু বিদেশিদের উচ্চারণ বড় খটমটে। দু'জনে কী কথা হল আমি পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে পারলাম, বিদেশি লোকটি এই মানুষটিকে চলে গিয়ে অন্য একজনকে আসতে বলছে। এই

বিদেশি মানুষটি নিশ্চয়ই কোনো বড় মানুষ, কারণ সে যখনই কথা বলে, ভালো কাপড়–পরা মানুষটি মাথা নেড়ে নেড়ে বলে, জ্বি স্যার, জ্বি স্যার, অবশ্যি স্যার—

মানুষটি বের হওয়ার পর ঘরে শুধু আমি আর বিদেশি মানুষটা। সে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসার মতো ভঙ্গি করল, আমার ইচ্ছে করল জিব বের করে একটা ভেংচি কেটে দিই। কিন্তু দিলাম না, হাজার হলেও একজন বিদেশি মানুষ। আমি মনে মনে বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কোন দেশের মানুষ?

বেশ কয়েকবার বলার পর বিদেশিটা বুঝতে পারল আমি কী জিজ্ঞেস করছি। উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন?

আমি আবার মনে মনে ইংরেজিতে অনুবাদ করে বললাম, দেখতে চাই কোন দেশের মানুষ এত বদমাইশ।

এই কথাটা কিন্তু সে একবারেই বুঝে গেল, আর আমার মনে হল কথাটা শুনে তার কেমন যেন একটু মন–খারাপ হয়ে গেল। লোকটা কেমন জানি সরু চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ।

দরজা খুলে এবার শাড়ি–পরা একজন মেয়ে এসে ঢুকল ঘরে। খুব সুন্দর চেহারা মেয়েটির, একেবারে সিনেমার নায়িকাদের মতো। মেয়েটি প্রথমে খানিকক্ষণ বিদেশি লোকটার সাথে কথা বলে আমার দিকে এগিয়ে এল, আমার গায়ে হাত দিয়ে বলল, আমার নাম শায়লা। তোমার নাম নিশ্চয়ই বিলু?

আমি মাথা নাড়লাম।

তুমি নাকি ঠিক করে কথা বলতে চাইছ না।

আপনারা ছেলেধরার দল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আগে পুলিশের সাথে কথা বলব।

ছেলেধরা? শায়লা নামের মেয়েটা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল হঠাৎ। একটু ইতস্তত করে বলল, তুমি তো সব কিছু জান না, তাই তোমার এরকম মনে হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কী চান?

আমরা চাই, তুমি যেন আমাদের সাহায্য কর।

কী সাহায্য?

আমরা যেন মহাকাশের প্রাণীটাকে আটকে ফেলতে পারি, তাহলে তোমার আর কোনো বিপদ থাকবে না। তুমি চলে যেতে পারবে।

আমি মেয়েটার মুখের দিকে তাকালাম, এত সুন্দর চেহারা মেয়েটার, কিন্তু কী রকম মিথ্যা কথা বলছে। জিজ্ঞেস করলাম, আটকে ফেলে কী করবেন?

তার উপর গবেষণা করা হবে।

তার কি কোনো ক্ষতি হবে?

ক্ষতি? ক্ষতি—না, মানে—ঠিক ক্ষতি হবে না মনে হয়।

কতদিন লাগবে গবেষণা করতে?

অনেকদিন, এক বছর, দুই বছর, দশ বছর।

ততদিন তাকে আটকে রাখবেন?

অনেক যত্ন করে রাখা হবে, কোনো অসুবিধে হবে না তার।

আমি কোনো কথা বললাম না, টুকুনজিল আমাকে বলেছে তিনদিনের মাঝে তাকে চলে যেতে হবে, যদি যেতে না পারে তাহলে আটকে পড়ে যাবে পৃথিবীতে। আর এরা তাকে জোর করে আটকে রাখতে চাইছে দশ বছর। আমি তো কিছুতেই সেটা হতে দিতে পারি না।

শায়লা নামের মেয়েটা বলল, কি হল, কথা বলছ না কেন?

আমি চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ, বিদেশি দালাল আর ছেলেধরার দলের সাথে কথা বলব না।

শায়লার মুখটা একটু লাল হয়ে গেল, বলল, তুমি কাকে চোর-গুণ্ডা বলছ? এই যে ইনি—এঁর নাম বব কার্লোস। ডক্টর বব কার্লোস। মহাকাশের প্রাণীদের অস্তিত্ব নিয়ে গবেষণা করেছেন সারা জীবন। পৃথিবীর সবাই তাঁকে এক ডাকে চেনে।

এই জন্যে তাঁর সাত খুন মাফ? আমাকে আগে ছেড়ে দিন, তারপর আমি কথা বলব।

কিন্তু ছেড়ে দিলে তোমার অনেক বিপদ—

মিথ্যুক।

তুমি যদি সাহায্য কর, তোমাকে অনেক বড় পুরস্কার—

মিথ্যুক ! মিথ্যুক!!

বিলু, তুমি অবুঝ হয়ো না। আমার কথা শোন—

আমি মিথ্যুকদের সাথে কথা বলি না।

শায়লা হাল ছেড়ে দিয়ে বব কার্লোস নামের বিদেশি লোকটার দিকে তাকাল। বব কার্লোস কিছু-একটা জিজ্ঞেস করল শায়লাকে, উত্তরে শায়লাও কিছু-একটা বলল। দু'জনে কথা হল বেশ খানিকক্ষণ। বব কার্লোসকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখায়। হেঁটে হেঁটে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। শায়লা আবার এগিয়ে আসে আমার দিকে, তার মুখে আগে যেরকম একটা হাসি-খুশির ভাব ছিল, এখন আর সেটা নেই। কেমন যেন কঠিন মুখ করে রেখেছে—দেখে একটু ভয়ই লাগে। শায়লা বলল, ডক্টর কার্লোস তোমাকে কয়েকটা কথা বলবেন, তুমি খুব মন দিয়ে শোন।

বব কার্লোস কথা বলতে শুরু করল। গলার স্বরটা গমগমে, একটা কথা বলে থেমে যায়, শায়লা তখন সেটা আমাকে বাংলায় অনুবাদ করে দেয়। বব কার্লোস বলল:

ছেলে, তুমি মন দিয়ে শোন আমি কি বলি। মহাকাশের এই প্রাণী আসছে আমরা দুই বছর থেকে জানি। আমাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, আমরা তাকে পৃথিবীতে আসতে সাহায্য করেছি। সে পৃথিবীতে এসে ডুব মেরেছে, আমাদের সাথে আর যোগাযোগ করছে না। কার সাথে যোগাযোগ করেছে? তোমার সাথে। কেন? ঘটনাক্রমে।

কিন্তু শুনে রাখ, পৃথিবীর সবগুলো উন্নত দেশ মিলে এক শ' এগারো বিলিওন ডলার খরচ করেছে এই প্রজেক্টে। এক শ' এগারো বিলিওন ডলার কত টাকা তুমি জান? জান না। তোমার দেশকে বেচলেও এত টাকা হবে না। কেন আমরা এই টাকা খরচ করেছি জান? কারণ, এই প্রাণী এমন অনেক টেকনোলজি জানে যেটা আমরা

==

জানি না। সেই টেকনোলজি শিখতে আমাদের এক শ' বছরে এক শ' ট্রিলিওন ডলার লেগে যাবে। হয়তো আরো বেশি। তাই শুনে রাখ, এটা খুব জরুরি। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলার জন্যে এই প্রজেক্ট শুরু করা হয় নি। এই প্রজেক্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তোমার জীবন, তোমার বন্ধুত্ব এসবের কোনো মূল্য নেই এই প্রজেক্টের সামনে। কোনো মূল্য নেই।

আমরা সব জানি। আমরা জানি এই প্রাণী তোমার কাছে ঘুরঘুর করে। আমরা তার কথাবার্তা খবরাখবর সবকিছু ধরতে পারি কিন্তু তাকে ধরতে পারি না। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই তাকে ধরতে পারি নি। কিছুতেই তাকে দেখতে পারি নি।

শেষ পর্যন্ত আমরা বুঝেছি কেন তাকে ধরতে পারি না। তোমার ডাক্তারের কাছ থেকে তোমার ফাইলটা আনা হয়েছে, সেখানে আমরা দেখেছি তুমি মহাকাশের প্রাণীর কথা বলেছ। আমরা প্রথমবার বুঝতে পেরেছি কেন আমরা তাকে কখনো দেখতে পারি নি, কারণ সে ছোট, খুবই ছোট। আমাদের জন্যে সেটা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর আবিষ্কার। আমাদের সব যন্ত্রপাতি নূতন করে তৈরি করতে হয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের। এখন আমরা আবার তাকে ধরার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি।

তোমাকে এখন আমাদের দরকার। তুমি যদি নিজে থেকে আমাদের সাহায্য কর, তাহলে ভালো। খুবই ভালো। যদি না কর, কোনো ক্ষতি নেই, আমরা তোমাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেব। শুনে রাখ ছেলে, তুমি বেঁচে থাক কি মরে যাও তাতে কিছু আসে যায় না—কিছু আসে যায় না। আমরা এই প্রজেক্টে এক শ' এগারো বিলিওন ডলার খরচ করেছি। এই টাকা আমরা পানিতে ফেলে দেব না। এই প্রাণীটা আমাদের দরকার। অনেক দরকার।

আমরা তাকে একটা নাম দিয়েছিলাম। এন্ড্রোসিলিকান। এন্ড্রোমিডা থেকে এসেছে, তাই এন্ড্রো, শরীরটা কার্বনভিত্তিক না হয়ে সিলিকনভিত্তিক বলে সিলিকান। দুই মিলে এন্ড্রোসিলিকান। আর এই প্রাণী নিজেকে কী বলে ডাকে? টুকুনজিল। টুকুনজিল একটা নাম হল! নাম হল? দুই বেলা নিজের জগতে খবর পাঠাচ্ছে, আমার নাম টুকুনজিল—আমার নাম টুকুনজিল। কী প্রচণ্ড ছেলেমানুষি। কী প্রচণ্ড নির্বুদ্ধিতা! কিন্তু কেন এটা করছে? কারণ তুমি তাকে এই নাম দিয়েছ। তুমি।

কী করছে এই হতভাগা প্রাণী? দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা তোমার পিছনে পিছনে ঘুরঘুর করছে। তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে সে সত্যি। বোঝার চেষ্টা করছে তুমি কেমন করে হাস। তুমি কেমন করে কথা বল। কেমন করে রাগ হও। হতভাগা টুকুনজিল! এক শ' এগারো বিলিওন ডলার খরচ করা হয়েছে এর পিছনে, আর এই প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার মতো একজন নির্বোধ ছেলের পিছনে। তুমি ভাবছ আমরা এটা মেনে নেব?

না। তুমি সাহায্য কর ভালো। যদি না কর কিছু আসে যায় না। তোমাকে আমরা ধরে এনেছি, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এখন তোমাকে ব্যবহার করব। তার কারণে তোমার যদি কোনো ক্ষতি হয়, কিছু করার নেই। তুমি যদি মরে যাও, কেউ যদি আর তোমাকে খুঁজে না পায়, কিছু করার নেই। এতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। পৃথিবীতে তোমার জন্যে কেউ ব্যস্ত নয়, তোমার পাগল বাবা কিছু করতে পারবে না। কেউ তার কথা শুনবে না।

বব কার্লোস কথা বন্ধ করে আমার চোখের দিকে তাকাল। মনে হল কেমন যেন বিষণ্ণ চোখের দৃষ্টি। মানুষের চোখের রং যদি নীল হয় তাকে দেখতে কেমন জানি অদ্ভুত দেখায়, মনে হয় যেন মানুষ নয়, যেন অশরীরী কোনো প্রাণী। খুব আস্তে আস্তে আমাকে জিজ্ঞেস করল, মহাকাশের প্রাণীকে ধরতে তুমি আমাদের সাহায্য করবে?

টুকুনজিলকে এরা আটকে ফেলবে? ফিরে যেতে দেবে না তার দেশে? কেটে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করবে? আমি কেমন করে সেটা করতে দিই তাদের? আমি মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বললাম, তুমি আর তোমার চৌদ্দ গুষ্টি জাহান্নামে যাও। আমি টুকুনজিলকে ধরিয়ে দেব না।

১২. কালরাত

খুব সুন্দর একটা ঘরে আমাকে আটকে রেখেছে। রাতে বিস্বাদ কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো খাবার খেতে দিয়েছে। ঘরে কোনো জানালা নেই। ধবধবে সাদা দেয়াল, উপরে উজ্জ্বল আলো। ঘরে আর একটি জিনিসও নেই, আমি চুপচাপ বসে থেকেছি। আমাকে দিয়ে কী করবে জানি না। বুকের ভেতর চাপা কেমন জানি একটা ভয়। বসে থেকে অপেক্ষা করতে-করতে আমি একসময় নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কারণ যখন ঘুম ভাঙল আমি একেবারে চমকে জেগে উঠলাম।

বেশ কয়েকজন মানুষ আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই বিদেশি। আমাকে ধরে প্রায় শূন্যে ঝুলিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল। চেয়ারটা খুব চমৎকার, মহাকাশচারীরা যেরকম চেয়ারে বসে রকেটে করে যায়, অনেকটা সেরকম। লোকগুলো চেয়ারের হাতলে আমার হাত দু'টি লাল রঙের নাইলনের ফিতা দিয়ে বেঁধে ফেলল। চেয়ার থেকে দু'টি বড় বড় বেল্ট বের হয়ে এসেছে, সেটা বুকের উপর দিয়ে নিয়ে আমাকে শক্ত করে বেঁধে ফেলল। পা দু'টি খোলা ছিল, এক জন সেগুলোও চেয়ারের নিচে কোথায় জানি আটকে দিল। চেয়ারটাতে মাথা রাখারও একটা জায়গা আছে সেখানে মাথাটা রেখে কপালের উপর দিয়ে একটা বেল্ট টেনে এনে মাথাটাও আটকে ফেলল।

আমি প্রথমে একটা বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু মানুষগুলো দৈত্যের মতো, তাদেরকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেও কোনো লাভ নেই, আমি কিছুক্ষণের মাঝে হাল ছেড়ে দিলাম। প্রচণ্ড আতঙ্কে আমি সেই আশ্চর্য চেয়ারে শক্ত হয়ে শুয়ে রইলাম।

চেয়ারটাতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নেয়ার পর এক জন কোথায় একটা সুইচ টিপে দিতেই চেয়ারটা আস্তে আস্তে উপরে উঠতে থাকে। আরেকটা সুইচ টিপে দিতেই চেয়ারটা কাত হয়ে লম্বা একটা বিছানার মতো হয়ে গেল। তখন আরেকজন লোক কপালের চারপাশে চুষনির মতো কী-একটা জিনিস লাগিয়ে দিতে থাকে, সেখান থেকে লম্বা ইলেকট্রিক তার বের হয়ে এসেছে। সেগুলো গিয়েছে পাশে রাখা নানারকম যন্ত্রপাতিতে—কিছুক্ষণের মাঝে ঘরটা যন্ত্রপাতিতে বোঝাই হয়ে গেছে। সেগুলো থেকে নানারকম আলো বের হচ্ছে, নানারকম শব্দ। লোকগুলো গম্ভীর মুখে যাওয়া-আসা করছে, যন্ত্রপাতি টানাটানি করছে, কথাবার্তা বলতে গেলে নেই, যেটুকু হচ্ছে খুব নিচু

গলায়।

আমি কয়েকবার জিজ্ঞেস করার চেষ্টা করলাম, কী করছ তোমরা? কী করছ?

কেউ আমার কথায় কোনো গুরুত্ব দিল না, এক জন শুধু দৈত্যের মতো হলুদ দাঁত বের করে হাসার ভঙ্গি করে বলল, কুনু বয় নায়।

কথাটির অর্থ নিশ্চয়ই "কোনো ভয় নেই", কিন্তু ভয়ে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। আমি কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছি, বুকের মাঝে হৃৎপিণ্ড ঢাকের মতো শব্দ করছে। ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার করে কাঁদি, কিন্তু দৈত্যের মতো লোকগুলোর মুখে মায়াদয়ার কোনো চিহ্ন নেই। দেখে মনে হয় দরকার হলে খুব ঠাণ্ডা মাথায় হাসিমুখে আমাকে মেরে ফেলবে।

কিন্তু আমাকে নিশ্চয়ই মারবে না। টুকুনজিলের সাথে যোগাযোগ করার জন্যে আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে না? প্রচণ্ড আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আমি অসহায়ভাবে শুয়ে কী হয় দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি।

বব কার্লোস এল একটু পরে, আমি তাকেও কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু আমাকে সে পুরোপুরি উপেক্ষা করে যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন সুইচ টিপে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। আমি কান পেতে লোকগুলোর কথা শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম, কি বলাবলি করছে বোঝার চেষ্টা করলাম। মনে হল আমার মস্তিষ্কের নানারকম তরঙ্গ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছে। সেগুলোকে একটা খুব শক্তিশালী এমপ্লিফায়ার দিয়ে বাড়িয়ে নিয়ে বাসায় ছাদে লাগানো এন্টেনা দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে দেবে। বব কার্লোসের দলবল আশা করছে টুকুনজিল আমার মস্তিষ্কের তরঙ্গের সাথে পরিচিত, কাজেই এই সংকেত পেয়ে বুঝতে পারবে আমি কোথায়, তখন ছুটে আমার সাথে দেখা করতে আসবে। এই ঘরে নানারকম যন্ত্রপাতি রাখা আছে, টুকুনজিল আসামাত্র তাকে ধরে ফেলা হবে।

টুকুনজিল আর যাই হোক, বোকা নয়। আমাকে অনেকবার বলেছে যে বিজ্ঞানীদের থেকে সে দূরে দূরে থাকতে চায়, কেন সেটা সে কখনো ঠিক করে বলে নি। এখন খানিকটা বুঝতে পারছি, সে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা আগেই টের পেয়ে গিয়েছিল। টুকুনজিল নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে, এটা তাকে ধরার একটা কৌশল, তাহলে কেন সে জেনেশুনে এই ফাঁদে পা দিতে আসবে আমি বুঝতে পারছিলাম না। যখন পুরোপুরি প্রস্তুতি নেয়া হল, তখন হঠাৎ করে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

দৈত্যের মতো এক জন মানুষ ছোট একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল, শার্টের হাতাটা একটু গুটিয়ে কিছু বোঝার আগে ঘ্যাঁচ করে আমার হাতে সিরিঞ্জটা বসিয়ে লাল রঙের ওষুধটা শরীরে ঢুকিয়ে দিল। সেই ওষুধটায় কী ছিল জানি না, কিন্তু হঠাৎ করে মনে হল কেউ যেন গনগনে জ্বলন্ত সীসা আমার শরীরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সমস্ত শরীরে যেন আগুন ধরে গেছে। সমস্ত শরীর প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উঠে আমার মনে হতে থাকে, কেউ যেন আমার শরীরের চামড়া ছিলে নিচ্ছে টেনে টেনে। আমি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় অমানুষের মতো চিৎকার করতে থাকি, মনে হতে থাকে আমার গলা দিয়ে বুঝি রক্ত বের হয়ে আসবে সেই চিৎকারে। লোকগুলো আমার চিৎকারে এতটুকু কান না দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করতে থাকে। আমার মনে হতে থাকে সমস্ত শরীর যেন আগুনে ঝলসে দিচ্ছে কেউ, মনে হতে থাকে

শরীরের এক-একটি অংশ যেন টেনে টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে শরীর থেকে।

প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আমি প্রায় অচেতন হয়ে যাচ্ছিলাম, তার মাঝে শুনলাম বব কার্লোস বলল, ভেরি গুড! ভেরি ভেরি গুড!

এর পর ইংরেজিতে কী বলল আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু মনে হল আমার প্রচণ্ড যন্ত্রণার ব্যাপারটি ঠিক তাদের মনের মতো হয়েছে, এবং সেই সংকেত নিখুঁতভাবে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। লোকগুলো খুব খুশিতে কথা বলতে থাকে, একজন কী-একটা বলল, অন্য সবাই তখন হো হো করে হেসে উঠল খুশিতে।

অসহায়ভাবে শুয়ে আমি প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকি। আমার চোখের কোনা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে, আমি তখন ভাঙা গলায় বাবাকে ডাকতে থাকি। বাবা—বাবা গো, তুমি কোথায়—

দ্বিতীয়বার ইনজেকশানটি দিল প্রায় আধা ঘন্টা পর। আবার আমি পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকি। মনে হতে থাকে যে মাথার মাঝে কিছু-একটা গোলমাল হয়ে গেছে, কিছুতেই আর চিৎকার থামাতে পারি না। সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। যন্ত্রণা যেন শরীরের মাঝে সাপের মতো কিলবিল করে ছুটতে থাকে, উপর থেকে নিচে, নিচে থেকে উপরে—মনে হতে থাকে বিষাক্ত ছুরি দিয়ে কেউ যেন গেঁথে ফেলছে আমাকে। আমার চোখের সামনে লাল রঙের আলো খেলা করতে থাকে, আমি পাগলের মতো ভাবতে থাকি, হায় খোদা, আমি এখনো মরে যাচ্ছি না কেন? কেন মরে যাচ্ছি না? কেন মরে যাচ্ছি না?

হঠাৎ কে যেন আমার ভেতরে বলে উঠল, বিলু! কি হয়েছে তোমার বিলু?

কে? টুকুনজিল? তুমি এসেছ!

ঘরের মাঝে সব কয়জন মানুষ তখন মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল। বব কার্লোস চিৎকার করে কী-একটা বলল, ঘরে ছোটাছুটি শুরু হয়ে গেল হঠাৎ, ঘড়ঘড় করে কোথায় একটা শব্দ হল। বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ খেলা করতে থাকে আর বিচিত্র শব্দে যন্ত্রপাতিগুলো আর্তনাদ করতে থাকে। তীব্র একটা লাল আলো একপাশে একটা জায়গা আলোকিত করে দেয়। ঝাঁঝালো একটা গন্ধ পেলাম আমি। লোকজনের উত্তেজিত কথাবার্তা আর যন্ত্রপাতির গুঞ্জনে কানে তালা লেগে যায় হঠাৎ।

টুকুনজিল আবার বলল, বিলু, তোমার কী হয়েছে? তুমি এরকম করছ কেন?

কষ্ট। বড় কষ্ট টুকুনজিল।

কষ্ট? সেটা কি?

আমি কোনোমতে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে চিৎকার করে কেঁদে ফেললাম। হঠাৎ করে আমার কপালে একটু গরম লাগতে থাকে, নিশ্চয়ই টুকুনজিল নামার চেষ্টা করছে। শুনলাম সে বলল, চার শ' তেরো মেগাসাইকেল। তিন মিলি সেকেন্ড পরপর। দুই তরঙ্গের অপবর্তন। অসম বন্টন। তোমার মস্তিষ্কের তরঙ্গে দেখি অনেক গোলমাল। দাঁড়াও, ঠিক করে দিই।

আমার কপালে চিনচিনে একটা ব্যথা অনুভব করলাম, তারপর হঠাৎ করে একেবারে ম্যাজিকের মতো সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। আমার তখনো বিশ্বাস হচ্ছিল

==

না, মনে হচ্ছিল একটু নড়লেই আবার যন্ত্রণা শুরু হয়ে যাবে, কিন্তু শুরু হল না। সমস্ত শরীর তখনো একটু একটু কাঁপছে, ঘামে ভিজে গেছে জামা-কাপড়। শরীরটা হালকা লাগছে হঠাৎ করে, মনে হতে থাকে যে বাতাসে ভেসে যাব আমি। বুকের ভেতর কেমন যেন আনন্দ এসে ভর করে।

আমি কিন্তু তখন ভেউ ভেউ করে কেঁদে বললাম, টুকুনজিল, তুমি না এলে এই রাক্ষসগুলো আমাকে মেরে ফেলত।

কেউ তোমাকে মারতে পারবে না, বিলু! আমি তোমাকে বাঁচাব।

এরা তোমাকে ধরতে চায়, টুকুনজিল।

আমাকে কেউ ধরতে পারবে না।

হঠাৎ বব কার্লোসের গলা শুনতে পেলাম আমি, ইংরেজিতে কী বলেছে ঠিক বুঝতে পারলাম না, 'এক মিনিট' কথাটা শুধু ধরতে পারলাম। আমি টুকুনজিলকে জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছে তুমি বুঝতে পারছ, টুকুনজিল?

হ্যাঁ। বলেছে এক মিনিটের মাঝে আমি যদি লেজার শিল্ডের মাঝে না ঢুকে যাই তাহলে তোমাকে মেরে ফেলবে। অত্যন্ত অর্থহীন অযৌক্তিক একটা কথা।

কেন?

লেজার শিল্ডটা তৈরি করেছে মেগাওয়াট পাওয়ার দিয়ে, ছোট একটা ফুটো রেখেছে ঢোকার জন্য, ঢোকার পর ফুটোটা বন্ধ করে দেবে। আমি লেজারলাইটের মাঝে আটকা পড়ে যাব। বের হতে চেষ্টা করলেই আমার মহাকাশযান মেগাওয়াট পাওয়ারে একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি কেন সেখানে ঢুকব? কখনো ঢুকব না।

আমি ঢোক গিলে বললাম, বলছে, তুমি না ঢুকলে আমাকে মেরে ফেলবে!

অত্যন্ত অযৌক্তিক ব্যাপার। দুটোর মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। আর মরে গেলে ঠিক কী হয়, বিলু?

আমি ছটফট করে বললাম, মরে গেলে সব শেষ।

কেন, শেষ কেন? আবার ঠিক করা যায় না?

না। মরে গেলে কেউ বেঁচে আসে না।

এটা হতেই পারে না।

আমি ঢোক গিলে বললাম, পারে টুকুনজিল, পারে। আমি জানি। তুমি কিছু-একটা কর তাড়াতাড়ি, কতক্ষণ হয়েছে?

ত্রিশ সেকেন্ড।

সর্বনাশ টুকুনজিল, একেবারে তো সময় নেই!

মরে গেলে শেষ কেন হবে? আমি দেখতে চাই কেমন করে শেষ হয়।

আমি চিৎকার করে বললাম, না, তুমি দেখতে চেয়ো না, টুকুনজিল। দেখতে চেয়ো না। কিছু-একটা কর।

হা হা হা। টুকুনজিল হঠাৎ হাসির মতো শব্দ করে বলল, এটা কি হাসির ব্যাপার?

না, এটা হাসির ব্যাপার না। ভয়ের ব্যাপার। ভয়ানক ভয়ের ব্যাপার। কিছু-একটা কর।

ঠিক আছে, তাহলে তোমাকে নিয়ে যাই এখান থেকে। হা হা হা।

পর মুহূর্তে কী হল ঠিক বুঝতে পারলাম না। প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হল, আগুনের একটা হলকা ছুটে এল আমার দিকে, আতঙ্কে চোখ বন্ধ করলাম আমি, আর হঠাৎ মনে হল আমি প্রচণ্ড বেগে আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছি। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না আমি, হঠাৎ মনে হল আমি বুঝি মরে যাচ্ছি—তারপর আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হবার পর আমার বেশ কিছুক্ষণ লাগল বুঝতে আমি কোথায়। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি সাদা ধোঁয়ার মতো। সামনে-পিছনে উপরে-নিচে চারদিকে হালকা সাদা ধোঁয়া। আমার মনে হতে থাকে, সাদা ধোঁয়ার মাঝে শূন্যে ঝুলে আছি আমি। একবার মনে হল আমি বোধহয় মরে গেছি। বেশি পাপও করি নি, বেশি পুণ্যও করি নি, তাই মনে হয় দোজখ আর বেহেশতের মাঝখানে ঝুলে আছি আমি।

আমার হাত-পা সারা শরীর তখনো চেয়ারের সাথে বাঁধা। ভালো করে নড়তে পারছি না, ভয়ে ভয়ে ডাকলাম, টুকুনজিল। তুমি কোথায়?

এই যে এখানে।

এখানে কোথায়?

তোমার চেয়ারের নিচে।

কেন? নিচে কেন?

তোমাকে ধরে রেখেছি।

ধরে রাখার দরকার কী?

মাধ্যাকর্ষণ বল। ধরে না রাখলে তুমি পড়ে যাবে।

কোথায় পড়ে যাব?

নিচে।

নিচে কোথায়?

নিচে মাটিতে। প্রায় সাত হাজার ফুট নিচে।

আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ভয়ে, ঢোক গিলে বললাম, আমি কোথায় টুকুনজিল?

আকাশে।

আকাশে? কী সর্বনাশ। তাড়াতাড়ি নিচে নামাও।

কেন?

আকাশে ঝুলে থাকবে কেমন করে? আকাশে কখনো কেউ ঝুলে থাকে নাকি?

তোমার শরীরে খুব ক্ষতিকর জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছিল। শরীর সেগুলো এখন পরিষ্কার করছে। সে জন্যে তোমার এখন ঘুমানো দরকার, মস্তিষ্কে এখন যেন কোনো অসম কম্পন না হয়, সেই জন্যে তোমাকে এখানে রেখেছি।

কোনোদিন শুনেছ কেউ আকাশে ঝুলে ঝুলে ঘুমায়?

এখানে কোনো শব্দ নেই, ধৈর্যচ্যুতি নেই, অসঙ্গতি নেই।

না থাকুক। আমাকে নিচে নামাও।

ঠিক আছে।

আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারি চেয়ারটা ভাসতে-ভাসতে নিচে নামতে শুরু

করেছে। ঠাণ্ডা বাতাসে শরীরটা মাঝে মাঝে শিউরে উঠছিল। চারদিকে তখনো সাদা ধোঁয়ার মতো মেঘ। হঠাৎ করে মেঘ কেটে গেল, আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নিচে রাস্তাঘাট বাড়িঘর গাছপালা পুকুর। মেঘের ফাঁকে আকাশে বড় চাঁদ, তার আলোতে সবকিছু কেমন যেন অবাস্তব মনে হতে থাকে। নিচে তাকিয়ে আমার হঠাৎ ভয়ে গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। যদি টুকুনজিল হঠাৎ ছেড়ে দেয় আমাকে? ভয়ে ভয়ে ডাকলাম আবার, টুকুনজিল।

বল।

তুমি এত ছোট একটা প্রাণী, আমাকে উপরে ধরে রেখেছ, কষ্ট হচ্ছে না তো?

আমি ধরে রাখি নি। আমার মহাকাশযান ধরে রেখেছে।

তোমার মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে তো?

আছে।

হঠাৎ করে ছেড়ে দিলে কিন্তু সর্বনাশ হয়ে যাবে। নিচে পড়লে আমি কিন্তু একেবারে চ্যাপ্টা হয়ে যাব। আমাকে ছেড়ে দিও না।

আমি তোমাকে বেশি সময়ের জন্যে কখনো ছাড়ি নি।

আমি চমকে উঠে বললাম, বেশি সময়ের জন্যে ছাড় নি মানে? কম সময়ের জন্যে ছেড়েছ কখনো?

হ্যাঁ। মাঝে মাঝে নিচে গিয়ে দেখে আসছি কি হচ্ছে।

আমি চিৎকার করে বললাম, সর্বনাশ! মাথা-খারাপ হয়েছে তোমার?

টুকুনজিল কোনো কথা বলল না। আমি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, টুকুনজিল।

তবু কোনো সাড়া নেই। আমি নিচে পড়ে যাচ্ছি মার্বেলের মতো। গলা ছেড়ে ডাকলাম আমি, টু-কু-ন-জি-ল।

কি হল?

কোনোমতে নিঃশ্বাস নিয়ে বললাম, কোথায় ছিলে তুমি?

নিচে গিয়েছিলাম দেখতে। ভারি মজা হচ্ছে নিচে। হা হা হা।

আমি ঢোক গিলে বললাম, আমাকে এভাবে ফেলে রেখে তুমি চলে যেও না আর, খবরদার! ফিরে আসতে একটু দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দেরি হবে না।

তবু তুমি যেয়ো না।

অনেক মজা হচ্ছে নিচে। হা হা হা। কেউ বুঝতে পারছে না কি হয়েছে।

হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমিও তো বুঝতে পারছি না কি হয়েছে।

খুব সোজা। প্রথমে তোমার সাথে লাগানো সব ইলেকট্রিক তারগুলো কেটে দিলাম। তারপর তোমাকে তুলে নিয়ে এলাম ঘরের মাঝখানে, সেখান থেকে দেয়ালে আঘাত করলাম পাথর ব্লাস্টার দিয়ে, তারপর ফুটো দিয়ে তোমাকে বের করে আনলাম। বেশি তাড়াতাড়ি বের করেছিলাম বলে তুমি সহ্য করতে পার নি, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে—

কী আশ্চর্য।

আশ্চর্য কেন হবে? আমার ইঞ্জিনগুলো ফিউশান দিয়ে কাজ করে, অনেক শক্তি

ইঞ্জিনে।

কথা বলতে বলতে আমরা ধীরে ধীরে নিচে নামছি। আস্তে আস্তে টুকুনজিলের উপর আমার বিশ্বাস ফিরে এসেছে। আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার কোনো ভয় নেই, আমাকে সে কখনোই ভুল করে ফেলে দেবে না। সত্যি কথা বলতে কি, আকাশে উড়ে বেড়াতে আমার বেশ মজা লাগতে শুরু করেছে। বললাম, টুকুনজিল।

বল।

আরো খানিকক্ষণ উড়ে বেড়ালে কেমন হয়?

না।

কেন?

তোমার ঘুম প্রয়োজন। অবশ্যি অবশ্যি প্রয়োজন। শরীরের সব ক্ষতিকর প্রভাব দূর হবে তা' হলে।

একটু দেরি হলে কোনো ক্ষতি নেই।

আছে। আমি তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

টুকুনজিলের কথা শেষ হবার আগেই হঠাৎ আমার চোখ বন্ধ হয়ে আসে ঘুমে। কোনোমতে বললাম, কোথায় নিয়ে রাখবে আমাকে?

তোমার বাসায়?

না না না।

তোমার স্কুলে?

স্কুলে? হ্যাঁ, স্কুলের রাখতে পার।

ঠিক আছে, এখন তুমি ঘুমাও। তোমার আর কোনো ভয় নেই।

আমার মনে হল সত্যি আমার আর কোনো ভয় নেই।

১৩. ব্ল্যাক মার্ডার

আমার খুব আরামের একটা ঘুম হল। এরকম আরামের ঘুম আমার অনেক দিন হয় নি। সেই যখন ছোট ছিলাম, তখন একপাশে মা আর অন্যপাশে বাবার সাথে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমাতাম, তখন মনে হয় আমার এরকম আরামের ঘুম হত। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা নেই, শুধু আরাম আর শান্তি আর সুখ। এত আরামে যে ঘুমিয়েছি আজ, কে জানে এর মাঝে হয়তো টুকুনজিলের হাত ছিল, মাথার মাঝে নিখুঁত সুষম কোনো কম্পন তৈরি করে দিয়েছে।

আমার ঘুম ভাঙল মানুষজনের কথার স্বরে। এক জন বলল, নিশ্চয়ই মরে গেছে।

আমাকে দেখেই নিশ্চয়ই বলছে। আমি চোখ খুলে ওঠার চেষ্টা করলাম। তখনো আমার হাত–পা–শরীর বাঁধা, উঠতে পারলাম না।

আরেকজন বলল, মরে নি, মরে নি। এখনো নড়ছে। কিন্তু মরে যাবে।

অনেক বেলা হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। চারদিকে বেশ আলো, গাছপালার নিচে আমি শুয়ে আছি। আমি চোখ পিটপিট করে তাকালাম। পাশে স্কুল বিল্ডিং, তার জানালা থেকে কথা বলছে সবাই।

==

এক জন চেঁচিয়ে বলল, আরে! এটা তো বিলু!

আমি গলার স্বরটা চিনতে পারলাম, তারিক কথা বলছে।

বিলু! বিলু! বিলু! বলে সবাই চেঁচামেচি করে দুপদাপ করে ছুটে আসতে থাকে। আমি টুকুনজিলকে ডাকলাম, টুকুনজিল।

বল।

আমার বন্ধুদের কি আমি তোমার কথা বলতে পারি?

তোমার ইচ্ছে। কিন্তু—

টুকুনজিলের কথা শেষ হবার আগেই দুপদাপ করে দৌড়ে সবাই হাজির হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এখানে কে বিলুকে বেঁধে ফেলে রেখে গেছে? কী সর্বনাশ! বিলু, তুই কেমন আছিস?

আমি বললাম, ভালো আছি আমি। কোনো চিন্তা নেই। আগে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দে।

সবাই টানাটানি করে আমার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিতে থাকে। সুব্রত বলল, সাবধান। এই জায়গাটা কিন্তু খুব খারাপ। অনেক সাপ আছে এখানে। তোর কপাল ভালো তোকে সাপে কামড়ায় নি।

শুনতে পেলাম টুকুনজিল বলল, দুইটা পুরুষ কেউটে, একটা মেয়ে কেউটে, চারটা দাঁড়াস। আমি না করে দিয়েছি—কেউ কাছে আসে নি। পশুপাখির বুদ্ধিবৃত্তি খুব সহজ, নিচু স্তরের। ওদেরকে কিছু বলা খুব সোজা।

টুকুনজিল সোজাসুজি আমার মাথার ভেতরে কথা বলছে, অন্যেরা তাই কিছু শুনতে পেল না, তাদের কাছে মনে হল একটা ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। পল্টু বলল, তোকে এখানে কে ফেলেছে? দিনের বেলাতেই ঝিঁঝি পোকা ডাকে। আর কত মশা দেখেছিস?

শুনলাম টুকুনজিল বলল, নয় হাজার সাত শ' চল্লিশটা মশা ছিল কাল রাতে। কেউ তোমার কাছে আসে নি। চার হাজার পাঁচ শ' তিরাশিটা পিঁপড়া। এক হাজার এগারোটা মাকড়শা, সাত শ' তেরোটা চিনে জোঁক, নয় শ' উনিশটা গুবরে পোকা—

খুলে দেয়ার পর আমি জায়গাটা চিনতে পারলাম। স্কুলের পিছনে গাছপালা ঢাকা জঙ্গলের মতো জায়গাটা। সাপখোপের ভয়ে কেউ কখনো এখানে আসে না, টুকুনজিল যে কী ভাবে এখানে আমাকে রেখেছে কে জানে!

তারিক বলল, তোকে কে এখানে এনে ফেলে রেখে গেছে?

আমি বললাম, সব বলব তোদের, চল্। তোরা আজকে এখানে কী করছিস?

ব্ল্যাক মার্ডারের মিটিং না?

ও, আচ্ছা। আমার উপর দিয়ে কত রকম ঝড় বয়ে গেছে যে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম আজকে স্কুলে ব্ল্যাক মার্ডারের গোপন মিটিং; আমার রক্ত-শপথ করে ব্ল্যাক মার্ডারের মেম্বার হওয়ার কথা। আমরা তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে আসছিলাম, নান্টু দাঁড়িয়ে বলল, চেয়ারটা দেখেছিস? ইস! কী দারুণ চেয়ার।

হ্যাঁ। একেবারে রকেটের চেয়ার।

আয় চেয়ারটা নিয়ে যাই।

আমি বললাম, এখন চল্। পরে নিলেই হবে।

কেউ যদি নিয়ে যায়?

কে নেবে এখান থেকে? তোর মাথা খারাপ হয়েছে?

নান্টু তবু খুঁতখুঁত করতে থাকে।

আমরা জঙ্গলের মতো জায়গাটা থেকে বের হয়ে আসি। সবাই এখনো একটা ঘোরের মতো অবস্থায় আছে, একটু পরপর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে। মাহবুব বলল, খালিপায়ে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছে না তো, বিলু?

আমি হেসে বললাম, আমি সারাজীবন খালিপায়ে হেঁটেছি, আমার কোনো অসুবিধে হয় না।

সুব্রত জিজ্ঞেস করল, তোর কি খিদে পেয়েছে?

আমার হঠাৎ খিদে চাগিয়ে উঠল। সত্যি খিদে পেয়েছে ভীষণ। বললাম, হ্যাঁ, খুব খিদে পেয়েছে।

তারিক বলল, তুই চিন্তা করিস না, আমরা খাবার নিয়ে আসব তোর জন্যে।

সুব্রত বলল, হ্যাঁ, তুই কোনো চিন্তা করিস না। তোকে আমরা এখন থেকে রক্ষা করব। আর কেউ তোকে কিছু করতে পারবে না।

আমার শুনে বড় ভালো লাগল।

ব্ল্যাক মার্ডারের গোপন মিটিং আধা ঘন্টার জন্যে পিছিয়ে দেয়া হল। পল্টু গেল আমার জন্যে কিছু খাবার কিনে আনতে। সে সম্ভবত ব্ল্যাক মার্ডারের ক্যাশিয়ার। মাহবুব গেল তার বাসা থেকে আমার জন্যে এক জোড়া জুতা আনতে। আমি কিছুতেই তাকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না যে আমি খালিপায়ে যতক্ষণ খুশি হাঁটাহাঁটি করতে পারি, আমার কোনো অসুবিধে হয় না। সুব্রত আর তারিক গেল অন্য মেম্বারদের ডেকে আনতে।

আমি একা স্কুলের বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে থাকলাম। গত চব্বিশ ঘন্টায় এত কিছু ঘটেছে যে মনে হচ্ছে অনেক দিন হয়ে গেছে। এই স্কুলে সবসময় এত ছাত্র গমগম করতে থাকে যে এখন কেউ কোথাও নেই দেখে কেমন জানি লাগে। আমি টুকুনজিলকে ডাকলাম কয়েকবার, সাড়া পেলাম না। কোথায় গেছে কে জানে। হয়তো আবার চট করে মঙ্গল গ্রহ থেকে ঘুরে আসতে গেছে! কী বিচিত্র একটা ব্যাপার! কে জানে কখনো আমাকে নিয়ে যেতে পারবে কি না?

নানান কথা ভাবতে ভাবতে একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম, হঠাৎ দেখি স্কুলের গেট খুলে লিটন এসে ঢুকল, তার সাথে আরো তিনজন ছেলে। এই তিনজনের একজনকেও আমি চিনি না, লিটনের বন্ধু। আমাকে দেখেই লিটনের মুখে কেমন–একটা হাসি ফুটে উঠল, খারাপ রকমের হাসি, এরকম হাসিকে আমি খুব ভয় পাই। কাছে এগিয়ে এসে তার বন্ধুদের বলল, বলেছিলাম না আজকে পেয়ে যাব?

আমি জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে রাখলাম। বললাম, আমাকে খুঁজছ তুমি?

লিটন আমার কথার উত্তর দিল না, বন্ধুদের বলল, একটা দল আছে ওদের, নাম দিয়েছে ব্ল্যাক মার্ডার। হাঃ—ব্ল্যাক মার্ডার! হেসে মরে যাই! আজকে নাকি মিটিং!

==

লিটন এবার আমার দিকে ঘুরে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, তোর আর স্যাগরেদরা কই?

ক্লাসের অনেকের সাথে আজকাল আমি তুই তুই করে বলি। ভালো বন্ধু, তাই। লিটনের সাথে বলতে গেলে আমার কথাই হয় না, তার সাথে তুই তুই করে কথা বলার কোনো প্রশ্নই আসে না। আমাকে তুই তুই করে বলছে বদমাইশি করে। আমি বেশি গা করলাম না, বললাম, এখানে কেউ কারো সাগরেদ না।

লিটন মুখ বাঁকা করে বলল, ভালোই হল, তোকে একা পেলাম।

কেন?

তোকে একটা জিনিস বলতে এসেছি।

কি জিনিস?

তুই যে–জঙ্গল থেকে এসেছিস সেই জঙ্গলে ফিরে যা!

কি বলতে চাইছে বুঝতে কোনো অসুবিধে হল না, কিন্তু আমি তবু না বোঝার ভান করে বললাম, মানে?

বলছি, তুই তোর নীলাঞ্জনা স্কুলে ফিরে যা।

কেন?

বলেছি ফিরে যেতে, ফিরে যা, বাজে তর্ক করিস না।

আস্তে আস্তে আমার মেজাজ আবার খারাপ হয়ে গেল, বলব না বলব না করেও বলে ফেললাম, আমি থাকলে ফার্স্ট হতে পারবি না?

মুহূর্তে লিটনের মুখ লাল হয়ে যায়। কিছু বোঝার আগে ধাক্কা মেরে আমাকে ফেলে দিল নিচে। আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম, প্রথম দিন স্কুলে আমাকে অসম্ভব মেরেছিল লিটন। আজকেও মারবে?

লিটনের তিনজন বন্ধু এবারে হাত গুটিয়ে এগিয়ে এল। লিটন একগাল হেসে বলল, এরা আমার কারাটে স্কুলের বন্ধু। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, ব্ল্যাক বেল্ট—ব্ল্যাক বেল্ট আর রেড বেল্ট।

মারামারি করবি?

তুই করবি?

তোরা চারজন আর আমি একা?

কেন, ভয় করে? কাপড়ে পেচ্ছাব হয়ে যাবে?

আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল, বললাম, লিটন, চারজন মিলে এক জনকে মারতে এসেছিস, লজ্জা করে না? বাপের ব্যাটা হলে একা আয়।

একা তো তোকে কিমা বানিয়েছিলাম! আজকে কিমা না, একেবারে কাবাব বানিয়ে ছেড়ে দেব। জন্মের মতো সিধে হয়ে যাবি। এই বলে রাখলাম। স্কুল ছেড়ে যদি না যাস তোর জান শেষ।

আগেরবার লক্ষ করেছি, মারপিট করার সময় লিটন হাত ব্যবহার না করে পা ব্যবহার করে, কে জানে কারাটের সেটাই হয়তো নিয়ম। পা দিয়ে দূর থেকে মারা যায়, জোরে মারা যায়—নানারকম সুবিধে। আমি সতর্ক থাকলাম, হঠাৎ করে মারতে দেব না।

লিটনের তিন বন্ধুর এক জন প্রথমে পা চালাল, ঘুরে লাফিয়ে উঠে উল্টো দিকে।

আমি সতর্ক ছিলাম, সময়মতো লাফিয়ে সরে গেলাম বলে মারতে পারল না, উল্টো আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে একটা ঘুসি মেরে দিলাম, গায়ের জোরে।

তারপর যেটা হল সেটা বিস্ময়কর। ছেলেটা ঘুসি খেয়ে ডিগবাজি খেয়ে উল্টে গেল, তারপর শূন্যে উড়ে গেল পাখির পালকের মতো। স্কুলের শিউলি গাছটার উপর দিয়ে উড়ে গেল ছেলেটা, দেয়াল পার হয়ে বাইরে গিয়ে পড়ল আছাড় খেয়ে। এত উপর থেকে যত জোরে পড়ার কথা তত জোরে পড়ল না, পড়ল অনেক আস্তে, না হলে আর বেঁচে থাকতে হত না বাছাধনের।

টুকুনজিল এসে গেছে আমার পাশে! আমার আর ভয় কি?

লিটন এবং তার বাকি দু'জন বন্ধুর চোখ একেবারে ছানাবড়া হয়ে গেছে। ফ্যাকাসে মুখে মাছের মতো ঢোক গিলল কয়েকবার, একবার আমার দিকে তাকাল, তারপর শিউলি গাছটার দিকে তাকাল, তারপর তাকাল দেয়ালের ওপাশে যেখানে তখনো তাদের বন্ধু উপুড় হয়ে পড়ে আছে। আমি একগাল হেসে বললাম, এবারে কে আসবি?

আর কেউ কাছে আসার সাহস পাচ্ছে না। কাজেই আমি এগিয়ে গেলাম, লাফিয়ে উঠে নেচে কুদে মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে ভয়ঙ্কর একটা ভঙ্গি করে লিটনের পেটে একটা ঘুসি হাঁকালাম, সাথে সাথে লিটন উড়ে গেল বাতাসে। হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে লিটন উড়ে যাচ্ছে, দৃশ্যটি বড় মজার, যে না দেখেছে তাকে বোঝানো যাবে না। টুকুনজিল তাকে নিয়ে ফেলল আরো দূরে মাঠের মাঝখানে। যত উপর দিয়ে গিয়েছে সত্যি সত্যি সেখান থেকে পড়লে শরীরের একটা হাড়ও আস্ত থাকত না, কিন্তু টুকুনজিল মোটামুটি যত্ন করেই তাকে আছাড় দিয়ে ফেলল।

অন্য দু'জন অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একটা ছোট লাফ দিয়ে হাত-পা ছুড়ে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে সামনে লাফিয়ে পড়তেই দু'জন একেবারে চোঁচা দৌড়। কোনো মানুষকে আমি আমার জীবনে এত জোরে দৌড়াতে দেখি নি।

লিটন স্কুলের মাঠ থেকে ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে প্রাণপণে ছুটতে থাকে।আমি খানিকক্ষণ তার পিছু পিছু ধাওয়া করি, স্কুলের দেয়ালের কাছে পৌঁছে একবার পিছন ফিরে তাকাল, তারপর প্রাণের ভয়ে খামচে খামচে এই ছয়ফুট দেয়ালটা টিকটিকির মতো উঠে গেল। অন্য পাশে কাঁচা নর্দমা, কিন্তু লিটনের তখন এত কিছু ভাবার সময় নেই। সে চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল সেখানে। ঝপাং করে একটা শব্দ হল, পড়ে ডুবে গেল কি না দেখতে পারলাম না।

স্কুলের বারান্দায় বসে হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে যায়। শুনলাম টুকুনজিলও হাসছে,হা হা হা, হি হি হি।

আমি বললাম, এখন তুমি ঠিক জায়গায় হাসছ টুকুনজিল। এটা আসলেই অনেক হাসির ব্যাপার!

==

১৪. শাস্তি

ব্ল্যাক মার্ডারের সবাই এসে গেছে, কামাল শুধু আসতে পারে নি, কার জন্মদিনে নাকি বেড়াতে গিয়েছে। আমার জন্যে পরোটা আর সবজি কিনে এনেছে পল্টু। খুব তৃপ্তি করে খেলাম আমি, মনে হচ্ছিল বছরখানেক থেকে না খেয়ে আছি! ক্লাসঘরে মিটিং বসেছে। ব্ল্যাক মার্ডারের মিটিং আমি আগে কখনো দেখি নি, তার কায়দাকানুনও জানি না, তাই চুপচাপ বসে আছি। তারিক মনে হয় ব্ল্যাক মার্ডারের দলপতি, উঠে দাঁড়িয়ে মিটিঙের কাজ শুরু করল। গলা কাঁপিয়ে খুব কায়দা করে বলল, কমরেডস। ব্ল্যাক মার্ডারের বীর সদস্যরা, সংগ্রামী অভিনন্দন।

যারা বসে ছিল, তারা হাত তুলে বলল, অভিনন্দন।

আজকে আমরা এসেছি অত্যন্ত জরুরি একটা মিশন নিয়ে। অত্যন্ত, অত্যন্ত জরুরী মিশন। বিলু—যে আজকে আমাদের নূতন সদস্য হবে, তার জীবন আজ বিপন্ন। দুর্বৃত্তদের হাতে তার প্রাণ আজ কুক্ষিগত। কে তাকে রক্ষা করবে?

সবাই একসাথে চিৎকার করে উঠল, ব্ল্যাক মার্ডার।

কে দুর্বৃত্তদের বিষদাঁত ভেঙে দেবে?

সবাই উত্তর দিল, ব্ল্যাক মার্ডার।

আমরা সভার কাজ এক্ষুণি শুরু করছি। কারো কিছু বলার আছে?

সুব্রত দাঁড়িয়ে বলল, আমি বিলু ওরফে নাজমুল করিমকে আমাদের নূতন সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তাব করছি।

মাহবুব দাঁড়িয়ে বলল, আমি এই প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।

তারিক গম্ভীর গলায় বলল, কেউ কি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য রাখতে চায়?

দেখা গেল কারো কোনো আপত্তি নেই। তারিক বলল, বিলু, রক্ত–শপথ নিতে তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?

আমি কথা বলার জন্যে মাত্র মুখ খুলেছি, ঠিক তখন কে যেন লাথি মেরে ক্লাসরুমের দরজা খুলে ফেলল। সবাই আমরা লাফিয়ে উঠলাম, অবাক হয়ে দেখলাম, দরজায় লাল মুখের কয়েকটা বিদেশি দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের হাতে মেশিনগানের মতো একধরনের অস্ত্র, সোজা আমাদের দিকে তাক করে আছে। লাল মুখের বিদেশিটা হলুদ দাঁত বের করে বলল, কুনু গুলমাল নায়। গুলমাল হইলে গুল্লি হইবে।

যার অর্থ কাউকে বুঝিয়ে দিতে হল না, কোনো গোলমাল না, একটু গোলমাল করলেই গুলি করে দেবে।

কেউ কোনো গোলমাল করল না। তারিকের মুখ হাঁ হয়ে গেছে। পল্টুর দিকে তাকানো যায় না, মনে হয় এক্ষুণি কেঁদে ফেলবে। সুব্রত একবার মুখ খুলছে, আরেকবার মুখ বন্ধ করছে মাছের মতো।

লাল মুখের বিদেশিটা আমাদের মুখের দিকে এক জন এক জন করে তাকাল। নিশ্চয়ই আমাকে খুঁজছে। আমাকে দেখেও কিন্তু চিনতে পারল না। আমার কাছে যেরকম সব বিদেশিকে দেখতে একরকম মনে হয়, সেরকম তাদেরও নিশ্চয়ই এই বয়সী সব ছেলেদের দেখতে একরকম মনে হয়। বিদেশিগুলো খানিকক্ষণ নিজেদের

মাঝে কথা বলল, তারপর আবার আমাদের দিকে তাকাল, হুঙ্কার দিয়ে বলল, বিললু কোথায়?

তারিক সবার আগে ব্যাপারটা একটু আঁচ করতে পারে, তারপর খুব একটা সাহসের কাজ করে ফেলল। হাত তুলে বলল, বিলু গন হোম। বাড়ি চলে গেছে।

হোয়াট?

এবারে সবাই মাথা নাড়ল, ইয়েস ইয়েস। গন হোম।

ঠিক এ সময় লালমুখো বিদেশি দু'জনকে ঠেলে বব কার্লোস এসে ঢুকল। তার পিছনে আরো মানুষ আছে, আমি ভালো কাপড়-পরা কালকের সেই দেশি মানুষটাকেও দেখলাম। বব কার্লোস আমাদের দিকে একনজর দেখেই আমাকে বের করে ফেলল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইংরেজিতে বলল, ঐ তো বিললু।

আমার নামটা পর্যন্ত ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। বব কার্লোসের কথা শুনে মেশিনগান হাতের বিদেশিটা হঠাৎ ভয়ঙ্কর রেগে উঠল। এক পা এগিয়ে এসে তারিকের চুলের মুঠি ধরে প্রায় ঝটকা মেরে উপরে তুলে ফেলে, হুঙ্কার দিয়ে বলে, ইউ লায়ার। ইউ লিটল স্কাউন্ড্রল।

তারিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। লালমুখো বিদেশিটা হাত তুলে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল তারিকের মুখে। তারিক একেবারে ছিটকে গিয়ে পড়ল নিচে, আমি দেখলাম ওঠার চেষ্টা করল, কিন্তু উঠতে পারল না।

বিদেশিটা ভয়ঙ্কর মুখ করে এগিয়ে যায় মেশিনগানটা হাতে নিয়ে। গুলি করে দেবে কি? না, গুলি করল না, পা তুলে জোরে লাথি মারল তারিককে—তারিক ছিটকে গিয়ে পড়ল অন্য পাশে।

আমার হঠাৎ মনে হল মাথার মাঝে যেন একটা বোমা ফেটে গেল হঠাৎ। প্রচণ্ড রাগে আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলাম, মনে হল শুওরের বাচ্চার মাথাটা ছিঁড়ে নিই এক টান দিয়ে। চিৎকার করে বললাম, থাম্ শুওরের বাচ্চা—

পশুর মতো মানুষটা আমার দিকে তাকাল, বলল, হোয়াট?

শুওরের বাচ্চার ইংরেজি কী হবে? চিন্তা করে পেলাম না, বললাম, ইউ পিগ—

লোকটা মনে হল খুব অবাক হয়ে গেল শুনে। লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল আমার দিকে। আমি ফিসফিস করে বললাম, টুকুনজিল—

টুকুনজিল বলল, আমি আছি। কোনো ভয় নেই তোমার।

জানে মেরো না কিন্তু।

মারব না? জানে মারলে মনে হয় ভালো হবে।

হোক। জানে মারবে না।

ঠিক আছে। তুমি যেটা বল।

মেশিনগান হাতে বিদেশিটা আমার কাছে এসে আমার চুলের ঝুঁটি ধরার চেষ্টা করছিল, বব কার্লোস প্রচণ্ড ধমক দিল, বিললুকে ধরবে না—

লোকটা থেমে গেল। কিন্তু আমার তো থামলে হবে না। চিৎকার করে বললাম, কত বড় সাহস, তুই আমার বন্ধুর গায়ে হাত দিস! কত বড় সাহস! তোর গায়ের চামড়া যদি আমি খুলে না নিই—

আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোকটার উপর, সাথে সাথে পল্টু, মাহবুব, সুব্রত, নান্টু—

==

সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল একসাথে। লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল, দমাদম কিল--ঘুসি--লাথি পড়তে থাকে, পাথরের মতো শরীর লোকটার, কিছু হয় না, কেমন যেন অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুকুনজিল এখনো হাত দেয় নি, যখন দেবে তখন আর বাছাধনকে দেখতে হবে না।

গা--ঝাড়া দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল লোকটা। হাতের মেশিনগানটা তুলে নিয়ে ট্রিগারটা টেনে দেয় হঠাৎ। ক্যাটক্যাট করে ভয়ঙ্কর শব্দ করে গুলি বের হয়ে আসে, ঝনঝন করে জানালার কাচ ভেঙে পড়ে, ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার হয়ে যায় এক মুহূর্তে। কাউকে কি মেরে ফেলেছে?

তাকালাম চারদিকে, না, কারো কিছু হয় নি, ভয় পেয়ে সবাই পিছনে সরে গেছে সময়মতো। পিশাচের মতো লোকটা হলুদ দাঁত বের করে ভয়ঙ্কর একটা মুখ করে তাকাল সবার দিকে।

কার্লোস বলল, কুইক। কুইক। তাড়াতাড়ি।

মেশিনগান হাতে লোক দু'টি আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি একটু অপেক্ষা করি, আরেকটু কাছে আসতেই লাফিয়ে ঘুরে একটা লাথি মেরে দিলাম বদমাইশটাকে।

টুকুনজিল হাত লাগাল আমার সাথে। লাথি খেয়ে লোকটা ছিটকে উপরে উঠে গেল গুলির মতো। ছাদে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে লোকটা ঘুরতে ঘুরতে সিলিং ফ্যানের মাঝে বেঁধে গেল। সেখান থেকে কী ভাবে জানি আবার ছিটকে উপরে উঠে যায়, ছাদে আবার ভয়ঙ্করভাবে ঠুকে গিয়ে পাঁইপাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে নিচে পড়তে থাকে। ক্লাসের পিছনে বেঞ্চটাতে আছাড় খেয়ে পড়ে বদমাইশটা। টুকুনজিল কোনো মায়া দেখায় নি, এত জোরে নিচে আছড়ে পড়ল যে বেঞ্চটা ভেঙে গেল মাঝখানে। লোকটার নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হয়ে আসে, আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না এখনো।

আমি এবার মেশিনগান হাতে দুই নম্বর লোকটার দিকে তাকালাম। সে হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, আমি যখন হ্যাঁচকা টান দিয়ে তার কাছ থেকে মেশিনগানটা কেড়ে নিলাম, সে বাধা দেয়ার সাহসও পেল না। মানুষ যেভাবে পাটখড়ি ভেঙে ফেলে, হাঁটুতে চাপ দিয়ে আমি মেশিনগানটা ভাঙার চেষ্টা করলাম। টুকুনজিল নিশ্চয়ই বুঝতে পারে নি আমি কী করতে চাইছি, প্রথমবার তাই ভাঙতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতেই সেটা মট করে ভেঙে দু' টুকরা হয়ে গেল পাটখড়ির মতো। ঘরে টু শব্দ নেই, সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি লোকটার কলার চেপে ধরার চেষ্টা করলাম, অনেক লম্বা, ভালো করে ধরা গেল না। কিছু আসে--যায় না তাতে, আমি হাত ঘুরিয়ে একটা ঘুসি চালালাম। লোকটা পাঁইপাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে উপরে উঠে গেল, ছাদে ঠোকা খেয়ে ধড়াম করে নিচে পড়ল কাটা কলাগাছের মতো। এই লোকটা বেশি কিছু করে নি বলে তার শাস্তিও হল কম।

এবারে আমরা সবাই ছুটে গেলাম তারিকের কাছে। তাকে টেনে সোজা করলাম সাবধানে, মেরেই ফেলেছে নাকি কে জানে। তারিক চোখ পিটপিট করে তাকাল, কপালের কাছে কেটে গেছে খানিকটা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারিক—কেমন আছিস

তুই? কেমন আছিস?

তারিক জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করল। শুনলাম টুকুনজিল বলছে, ভালোই আছে এখন।

সত্যি?

হ্যাঁ, একটা ধমনী ছিঁড়ে গিয়েছিল ভেতরে, ঠিক করে দিয়েছি।

তুমি ঠিক করে দিয়েছ? তুমি?

হ্যাঁ। চামড়া ফুটো করে শরীরের ভেতর ঢুকে গেলাম—

শরীরের ভেতর ঢুকে গেলে?

তারিক ফিসফিস করে বলল, কার সাথে কথা বলছিস তুই?

আমি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললাম, বলব তোদের। আগে এদের টাইট করে নিই।

আমি এবারে বব কার্লোসের মুখের দিকে তাকালাম। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, এবারে তুমি।

বব কার্লোসের মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল সাথে সাথে, মাথা নেড়ে বলল, নো, নো, প্লিজ।

আমি দাঁতে দাঁত ঘষে বললাম, তুমি হচ্ছ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী, সাইন্টিস্ট। তুমি এক শ' এগারো বিলিওন ডলার খরচ করে এসেছ এখানে, তোমার কাছে মানুষের জানের কোনো দাম নেই—

আমার বাংলা কথা বুঝতে পারছে না সে, মাথা ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে সে এদিকে-সেদিকে। আমি হুঙ্কার দিয়ে বললাম, এমন শাস্তি দেব আমি, যে, তুমি জন্মের মতো সিধে হয়ে যাবে।

পল্টু অনুবাদ করার চেষ্টা করল, স্ট্রেট ফর দা হোল লাইফ।

আমি কার্লোসের দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করতেই সে মাটি থেকে উপরে উঠতে থাকে, ফুট খানেক উপরে উঠে সে স্থির হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, তাকে দেখাতে থাকে বোকার মতো। কোনো মানুষ যদি শূন্যে ঝুলতে থাকে তার পক্ষে কোনোরকম গাম্ভীর্য দেখানো খুব শক্ত।

ক্লাসঘরের সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকে কার্লোসের দিকে। নিজের চোখকে কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না, কিন্তু চোখের সামনে দেখে অবিশ্বাস করবে কেমন করে? আমি সবার দিকে তাকালাম, জিজ্ঞেস করলাম, কি শাস্তি দেয়া যায় বল তো?

তারিক বলল, সারা জীবনের জন্যে ঝুলিয়ে রেখে দে।

পল্টু মাথা নাড়ল, না, না, ক্লাসের ভেতরে না। বাইরে, বাইরে—

সুব্রত বলল, চেহারাটা বাঁদরের মতো করে দে।

নাকটা ঘুরিয়ে দে, নাকের গর্তগুলো উপরে। প্রত্যেক বার নাকঝাড়ার সময় রুমাল দিয়ে চোখ বন্ধ করে রাখতে হবে—

খারাপ না আইডিয়াটা। হাত আর পাগুলো পাল্টে দে। যেখানে হাত সেখানে পা, যেখানে পা সেখানে হাত—

==

বাইরে হঠাৎ অনেক লোকজনের গোলমাল শোনা গেল। গুলির শব্দ শুনে সবাই ছুটে আসছে। আমাদের পালাতে হবে এক্ষুণি, নাহয় ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। আমি বব কার্লোসের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু তুমি বড় খারাপ মানুষ।

বব কার্লোস অসহায় মুখ করে আমার দিকে তাকাল। আমি ভালো কাপড়-পরা দেশি মানুষটিকে বললাম, কি বলছি বুঝিয়ে দিন।

লোকটা ছুটে কাছে এসে হড়বড় করে বব কার্লোসকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দিতে থাকে। আমি চোখ পাকিয়ে বললাম, বিজ্ঞানী যদি খারাপ হয় সেটা খুব ভয়ঙ্কর, বিজ্ঞানীদের হতে হয় ভালো। কিন্তু তুমি ভালো না, তুমি খারাপ, অনেক খারাপ। তাই তোমার কাছ থেকে সব বিজ্ঞান সরিয়ে নেব আমি। আজ থেকে তুমি আর বিজ্ঞানের একটি কথাও জানবে না—একটি কথাও না—তুমি হবে সাধারণ এক জন মানুষ।

বব কার্লোস ফ্যাকাসে মুখে হাতজোড় করে বলল, নো-নো-নো—

আমি ফিসফিস করে বললাম, টুকুনজিল—

বল।

ব্যাটাকে ঝুলিয়ে রাখতে কোনো কষ্ট হচ্ছে তোমার?

না। কোনো কষ্ট না।

বব কার্লোসের মাথাটা খালি করে দিতে পারবে? না পারলে থাক।

আগে কখনো করি নি। কপাল দিয়ে ঢুকে যাব, মস্তিষ্কের যে নিউরোনগুলোতে তথ্য আছে, সেগুলো খালি করে দিতে হবে। মনে হয় পারব।

দেখ চেষ্টা করে। আর যেন ব্যাটা পৃথিবীর কোনো ক্ষতি করতে না পারে।

পারবে না।

অনেক মানুষের হৈচৈ শোনা গেল। আমি বললাম, ব্ল্যাক মার্ডার, পালা এখন।

পালাব কেন? নান্টু গরম হয়ে বলল, পুলিশের কাছে ধরিয়ে দেব না?

ধরাতে পারবি না। পুলিশের বাবা ওরা কিনে রেখেছে। সময় থাকতে পালা। না হলে উল্টো ঝামেলায় পড়ে যাবি। আমার কথা শোন।

তাই বলে এত বড় বদমাইশ—

আর বদমাইশি করতে পারবে না। জীবনেও করতে পারবে না।

আমি তারিককে তুলে বললাম, হাঁটতে পারবি, তারিক?

পারব, যত ব্যথা পেয়েছিলাম এখন আর সেরকম ব্যথা লাগছে না।

অনেক লোকজন দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল, অনেকে লাঠি হাতে এসেছে, কাকে ধরে দু'এক ঘা লাগাবে বুঝতে পারছে না। অনেক ভিড় হৈচৈ, তার মাঝে আমরা বের হয়ে গেলাম, কেউ লক্ষ করল না। কেমন করে লক্ষ করবে? ঘরের মাঝখানে একটা মানুষ শূন্যে ঝুলে আছে, তখন কেউ কি আর অন্যকিছু লক্ষ করতে পারে?

আমরা রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম, পল্টু বলল, বিলু, তুই কেমন করে এতসব করলি? একেবারে যেন ম্যাজিক—

বলব, সব বলব। আগে তারিককে বাসায় পৌঁছে দে কেউ–এক জন। আর শোন্, আজ স্কুলে যা দেখেছিস ভুলেও কাউকে বলিস না। একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে কিন্তু। বব কার্লোসের দলবল ভীষণ ভয়ঙ্কর, আমাদের সবাইকে কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবে, তবু কেউ কিছু করতে পারবে না।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি। আজ সবাই বাসায় যা। আমি বলব।

আমি বাসায় ফিরে যেতে যেতে ডাকলাম, টুকুনজিল।

বল।

বব কার্লোসের কী অবস্থা হল?

এখনো ঝুলিয়ে রেখেছি।

সে কী? কেমন করে? তুমি তো আমার সাথে কথা বলছ!

হ্যাঁ, তোমার সাথে একটু কথা বলি আবার ওখানে যাই—খুব তাড়াতাড়ি করতে পারি আমি। মাইক্রোসেকেন্ডে দু'বার ঘুরে আসি।

তাই তো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কী হচ্ছে এখন?

অনেক মজা হচ্ছে এখন। হা হা হা।

কি মজা হচ্ছে?

পুলিশ এসেছে। সবাই মিলে পা ধরে টানছে নামানোর জন্য।

নামাতে পারছে না?

না। কেমন করে পারবে? একটু তোমার সাথে কথা বলি, আবার ওখানে গিয়ে ধরে রাখি।

কতক্ষণ ধরে রাখবে?

বেশিক্ষণ না। খবরের কাগজ থেকে লোক আসছে। তারা আসার আগেই ছেড়ে দেব—বেশি জানাজানি না হওয়াই ভালো, কি বল?

হ্যাঁ।

খানিকক্ষণ পর টুকুনজিল বলল, ভারি মজা হচ্ছে এখন।

কি মজা?

প্যান্ট ধরে টানতেই প্যান্টটা খুলে এসেছে। লাল রঙের একটা আন্ডারঅয়ার পরে ঝুলে আছে এখন। ভারি মজা হচ্ছে। হা হা হা।

লোকজন কি অবাক হচ্ছে?

ভারি অবাক হচ্ছে। ছেড়ে দেব এখন?

দাও।

বিদেশিগুলো এখন টানছে। ছেড়ে দিচ্ছি।

দাও।

হা হা হা।

কি হল?

সবাই মিলে হুড়মুড় করে পড়েছে নিচে। ভারি মজা হল আজকে।

==

এখন কী হচ্ছে?

বব কার্লোস এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। তাকে এক জন জিজ্ঞেস করছে দুই-এর সাথে দুই যোগ করলে কত হয়, ভেবে বের করতে পারছে না। আবার তাকে সব শিখতে হবে। একেবারে গোড়া থেকে।

উচিত শিক্ষা হল। কি বল?

১৫. ফেরা

ছোট খালা আমাকে দেখে সরু চোখে তাকিয়ে বললেন, কোথা থেকে আসা হয়েছে লাটসাহেবের?

আমি কিছু বললাম না। ছোট খালা চিৎকার করে উঠলেন এবারে, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি?

আমি এবারেও কিছু বললাম না। কী বলব ছোট খালাকে? বব কার্লোসের দল ধরে নিয়ে গিয়েছিল? টুকুনজিল আমাকে বাঁচিয়ে এনেছে? ছোট খালাকে এটা বিশ্বাস করানো থেকে মনে হয় মাথাটা কেটে হাতে নিয়ে নেয়া সোজা। আমি তাই সে চেষ্টা করলাম না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কি হল, কথা বলছিস না কেন?

আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেক শিক্ষা হয়েছে আমার। ভেবেছিলাম বুবুর জন্যে একটা কাজ করব, তোকে মানুষ করে দেব। লাভের মাঝে লাভ হল কি? গ্রামের ছেলে শহরে এসে গুণ্ডা হয়ে গেলি। গুণ্ডা। একেবারে পরিষ্কার গুণ্ডা। সুযোগ পেলেই রাস্তায় গিয়ে মারপিট করে আসিস।

ছোট খালা একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন, কাল সারা রাত কোথায় ছিলি? কোথায়? মদ-গাঞ্জাও কি খাওয়া শুরু করেছিস এই বয়সে? সারা রাত যে তোর ছোট খালু হাসপাতাল আর থানায় দৌড়াদৌড়ি করেছে, সেই খবর কি আছে? এখন ড্যাং-ড্যাং করে লাটসাহেব বাড়ি ফিরে এলেন। বাপের বাড়ির বান্দী পেয়েছিস আমাকে যে তোর জন্যে রান্না করে বসে থাকব সারা রাত।

হঠাৎ টুকুনজিলের কথা শুনতে পেলাম, দেব থামিয়ে?

কেমন করে?

মস্তিষ্কের যে অংশে কথা বলার কন্ট্রোল, সেটা একটু পাল্টে দিলেই হবে। দেব?

না, থাক। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোট খালার বকুনি শুনতে থাকি।

ঘন্টাখানেক পর বল্টু আমাকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। বাড়ি থেকে এসেছে। চিঠিটা নিশ্চয়ই খুলে পড়ে আবার আঠা দিয়ে লাগানো হয়েছে। আঠাটা এখনো শুকায় নি। আমি সেটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। ভিতরে রাঙাবুবুর একটা চিঠি। রাঙাবুবু

লিখেছেঃ

বিলু

ভেবেছিলাম তোকে লিখব না। কিন্তু না লিখেই থাকি কেমন করে? বাবার খুব শরীর খারাপ, গত এক সপ্তাহ থেকে বিছানায়। তোকে দেখার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছেন। মাঝরাতে উঠে বসে থাকেন, বলেন, দরজা খোল, বিলু এসেছে।

তুই চলে আয়, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে বাবা আর বাঁচবেন না। বাড়িতে তুই ছাড়া পুরুষমানুষ নাই। মনে হয় এখন তোকে দায়িত্ব নিতে হবে।

বাবার পাগলামিটাও খুব বেড়েছে। বড় কষ্ট হয় দেখলে।

রাঙাবুবু।

আমি চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, সবকিছু অর্থহীন হয়ে গেল হঠাৎ। বাবা মারা যাবেন? তাহলে আমার আর থাকবে কে? বিছানায় মাথাগুঁজে আমি ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম।

টুকুনজিল আমাকে ডাকল, বিলু।

কি?

তোমার কী হয়েছে, বিলু? মন–খারাপ?

হ্যাঁ।

অনেক মন–খারাপ?

হ্যাঁ টুকুনজিল, আমার অনেক মন–খারাপ। আমার বাবার নাকি অনেক শরীর খারাপ। রাঙাবুবু লিখেছে, বাবা নাকি মরে যাবেন।

আমি আবার ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করলাম। টুকুনজিল বলল, তুমি কেঁদো না বিলু, তুমি যখন অনেক মন–খারাপ করে কাঁদতে শুরু কর, তখন তোমার মস্তিষ্কের কম্পনে চতুর্থ মাত্রার একটা অপবর্তন শুরু হয়; সেটা ভালো না। নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায় তখন।

আমি চোখ মুছে বললাম, ঠিক আছে, আমি আর কাঁদব না।

এখন তুমি কী করবে?

আমি বাড়ি যাব এক্ষুণি। ট্রেন ছাড়বে কখন কে জানে। ট্রেন না থাকলে বাসে যাব।

তোমাকে আমি তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাব?

পারবে নিতে? পারবে?

কেন পারব না!

কেমন করে নেবে?

আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাব।

সত্যি? কতক্ষণ লাগবে যেতে?

দেখতে–দেখতে পৌঁছে যাবে তুমি।

চল তাহলে যাই। চল। চল। এক্ষুণি চল।

যাওয়ার আগে ছোট খালাকে বলে যেতে হবে। রান্নাঘরে কী কাজ করছিলেন, গিয়ে বললাম, ছোট খালা, আমার বাবার খুব অসুখ। আমি বাড়ি যাব।

===

ছোট খালা অবাক হওয়ার ভান করলেন, বললেন, কি অসুখ?

জানি না।

ঠিক আছে, বাড়ি যেতে চাইলে যাবি। তোর খালু আসুক।

আমি এখনই বাড়ি যাব।

এখন কেমন করে যাবি? ট্রেনের সময় দেখতে হবে না? ছোট খালা আমাকে পুরোপুরি বাতিল করে দিয়ে আবার নিজের কাজে মন দিলেন। ছোট খালার সাথে আর কথা বলার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি আমার ঘরে এসে একটা কাগজে একটা ছোট চিঠি লিখলাম।

ছোট খালা ও খালু ঃ

রাঙাবুবু লিখেছে, বাবার খুব শরীর খারাপ। আমি তাই বাড়ি চলে গেলাম। আমার জন্যে আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। আমি ঠিকভাবে বাড়ি পৌঁছে যাব।

ইতি বিলু।

একটু ভেবে নিচে লিখলাম,

পুনঃ আমি এখন থেকে বাড়ি থেকেই পড়াশোনা করব। আমার জন্যে আপনাদের অনেক ঝামেলা হল।

চিঠিটা ভাঁজ করে টেবিলের উপর রেখে আমি চুপি চুপি ছাদে চলে এলাম।

ভরা–দুপুর এখন। রাস্তায় রিকশা যাচ্ছে, মানুষজন হাঁটাহাঁটি করছে। পাশের ছাদে এক জন কাপড় নেড়ে দিচ্ছে। কার্নিশে দুটো শালিখ প্রচণ্ড ঝগড়া করছে কী–একটা নিয়ে। আমি তার মাঝে টুকুনজিলকে বললাম, টুকুনজিল।

বল।

চল যাই। কোথায় যেতে হবে তোমাকে বলে দিই।

আমি জানি।

জান! আমি অবাক হয়ে বললাম, কেমন করে জান?

তুমি যা জান আমি তাই জানি। আমি তোমার মস্তিষ্কের মাঝে দু'বেলা ঘুরে বেড়াই। হা হা হা।

তুমি আমার বাড়ি গিয়েছ?

হ্যাঁ।

বাবাকে দেখেছ?

হ্যাঁ।

কেমন আছে বাবা? কেমন আছে?

টুকুনজিল রহস্য করে বলল, চল, গেলেই দেখবে।

বল না, এখন বল।

উঁহু। তুমি প্রস্তুত?

হ্যাঁ।

চল আমরা আকাশে উড়ে যাই।

পরমুহূর্তে আমি বাতাসে ভেসে উপরে উঠে গেলাম। আমার সমস্ত শরীর যেন পাখির

পালকের মতো হালকা। প্রথম কয়েক মুহূর্ত ভয়ের চোটে আমি প্রায় নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেলাম, মনে হতে থাকল এই বুঝি পড়ে গেলাম আকাশ থেকে, হাড়গোড় ভেঙে ছাতু হয়ে গেলাম জন্মের মতো।

কিন্তু আমি পড়ে গেলাম না, বাতাসে ভেসে আরো উপরে উঠে গেলাম। ভেবেছিলাম নিচে থেকে একটা রৈরৈ রব উঠবে, লোকজন চিৎকার করে কেলেঙ্কারি শুরু করে দেবে, কিন্তু কী আশ্চর্য, একটি মানুষও লক্ষ করল না। কেউ যেটা কখনো আশা করে না, সেটা দেখার চেষ্টাও করে না, তাই খোলা আকাশে আমি নির্বিঘ্নে পাখির মতো উড়ে গেলাম।

আমার মিনিটখানেক লাগল ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হতে। তখন আমি আস্তে আস্তে একটু একটু হাত–পা নাড়তে শুরু করলাম। পানিতে মানুষ যেরকম করে সাঁতার কাটে অনেকটা সেভাবে। আমার মনে হতে লাগল আমি নীল গাঙে সাঁতার কেটে যাচ্ছি। একটু অভ্যাস হবার পর আমি একটা ডিগবাজি দিলাম বাতাসে, ঘুরপাক খেলাম কয়েকবার, তারপর চিলের মতো দু'হাত মেলে উড়ে যেতে থাকলাম আকাশে।

কী মজা উড়তে, টুকুনজিল!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, তুমি তো জান। তুমি তো উড়ে বেড়াও।

হ্যাঁ, আমি নিজে তো উড়তে পারি না, আমার মহাকাশযানে করে আমি উড়ে বেড়াই।

প্লেনের মতন?

অনেকটা সেরকম, কিন্তু তার থেকে অনেক সাবলীল। প্লেনের আকাশে ওড়ার জন্যে রানওয়ে লাগে, নামার জন্যেও রানওয়ে লাগে। তা ছাড়া যখন যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে যেতে পারে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়েও থাকতে পারে না। আমার মহাকাশযান তা পারে। তা ছাড়া আমি অসম্ভব দ্রুত যেতে পারি। এত দ্রুত যে তুমি চিন্তাও করতে পারবে না।

হ্যাঁ। সে জন্যেই কার্লোস তোমাকে এভাবে ধরতে চেয়েছিল। ধরে বুঝতে চেয়েছিল তুমি কী ভাবে সেটা কর।

হ্যাঁ। কিন্তু জ্ঞানের মাঝে কোনো শর্টকাট নেই! আমি যদি পৃথিবীর মানুষকে তাদের অজানা কিছু বলে দিই, তাহলে সেটা তো আর জ্ঞান হল না, সেটা হল ম্যাজিক। সেই ম্যাজিক পৃথিবীর মানুষ নিয়ন্ত্রণ করবে কেমন করে? অনেকটা হবে তোমাদের গল্পের দৈত্যকে বশ করার মতো। একটু যদি ভুল হয়, তাহলে উল্টো সেই দৈত্য তোমাকে ধ্বংস করে ফলবে।

তা ঠিক।

আমি একটা মেঘের মাঝে ঢুকে যাচ্ছিলাম, ভিজে কুয়াশার মতো মেঘ। মেঘ থেকে বের হতে হতে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা টুকুনজিল, আমি এইভাবে উড়ছি কেমন করে? তুমি ঠিক কী ভাবে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছ?

তোমার ভাষায় বলা যায় আমি তোমাকে ঘাড়ে করে নিয়ে উড়ে যাচ্ছি। কিন্তু যেহেতু আমি খুব ছোট, তাই তোমার শরীরের এক জায়গায় ধরে না রেখে শরীরের

==

তিন হাজার দু' শ' নয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দুতে ধরে নিয়ে যাচ্ছি! আমি খুব দ্রুত যেতে পারি, কাজেই সেটা কোনো সমস্যা নয়। নিচে থেকে তোমাকে উপরে ধরে রেখেছি, তুমি টের পাচ্ছ না, কারণ এক–একটা বিন্দুতে আমি এক আউন্স থেকেও কম চাপ দিচ্ছি!

টুকুনজিল একটু থেমে বলল, একটা প্লেন আসছে।

আমি ভয় পেয়ে বললাম, আমাকে ধরতে?

না। যাত্রী নিয়ে যাচ্ছে। দেখতে চাও?

কোনো ভয় নেই?

না। অনেক নিচে দিয়ে যাচ্ছে, তোমার নিঃশ্বাস নিতেও কোনো অসুবিধে হবে না। গতিবেগ একটু বেশি, তাই তোমাকে ঘিরে কোনো ধরনের একটা বলয় তৈরি করে দিতে হবে।

পারবে করতে?

পারব। হ্যাঁ, চল যাই।

আমি হাত দু'টি উঁচু করলাম, মানুষ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবে। সোজা উপরে উঠে ডান দিকে ঘুরে গেলাম পাখির মতো।

প্লেনটা বেশি বড় না। পাখার দু'পাশে দু'টি প্রপেলার প্রচণ্ড শব্দ করে ঘুরছে। প্লেন যে এত শব্দ করে আমি জানতাম না, প্রথমে খানিকক্ষণ কানে হাত দিয়ে থাকতে হল, একটু পর অবশ্যি শব্দটা অভ্যেস হয়ে গেল, হতে পারে টুকুনজিল কিছু–একটা করে দিল যেন শব্দটা শুনতে না হয়। টুকুনজিলের অসাধ্য কিছু নেই! আমি প্লেনের পাশে পাশে উড়তে উড়তে সাবধানে একটা পাখার উপর দাঁড়ালাম। বাতাসে আমার চুল উড়ছে, মেঘের মাঝে উড়ে যাচ্ছি আমি, কী যে চমৎকার লাগছে তা আর বলার নয়।

প্লেনের গোল গোল জানালা দিয়ে মানুষজন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে, কেউ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, চোখ বিস্ফারিত, মুখ হাঁ করে খুলে আছে। আমি তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লাম, সবাই এত হতবাক হয়ে গেছে যে, কেউ হাত নেড়ে আমাকে উত্তর দিল না। শুধু একটা ছোট বাচ্চা খুশিতে হেসে আমার দিকে হাত নাড়তে শুরু করল। আমি বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে হাসলাম, তারপর আবার হাত নাড়লাম, বাচ্চাটা আরো জোরে হাত নেড়ে লাফাতে শুরু করল। এবারে বাচ্চাটার দেখাদেখি আরো কয়েকজন হাত নাড়ল আমার দিকে।

টুকুনজিল বলল, চল ফিরে যাই।

চল।

আমি দুই হাত উপরে তুলে একটা ডিগবাজি দিলাম বাতাসে। তারপর দু হাত দু পাশে ছড়িয়ে প্লেনের মতো উড়ে গেলাম ডানদিকে। ঘুরে একবার পিছনে তাকালাম আমি, প্লেনের সব মানুষ এবারে পাগলের মতো হাত নাড়ছে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি শেষবারের মতো হাত নেড়ে নিচে নামতে শুরু করলাম। অনেক দিন মনে রাখবে সবাই পুরো ব্যাপারটা।

নিচে নামাতে নামাতে টুকুনজিল আমাকে একেবারে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে আনল। ধানক্ষেত, নদী, নৌকা, ছোট ছোট বন–জঙ্গল, কী চমৎকার দেখায় উপর থেকে। আমি পাখির মতো উড়ে যাচ্ছি বাতাসে, আর নিচে মাঝিরা নৌকা বেয়ে যাচ্ছে,

চাষীরা কাজ করছে মাঠে, বৌ–ঝিরা কলসি নিয়ে পানি আনছে পুকুর থেকে, মাঠে খেলছে বাচ্চারা।

মজার ব্যাপার হল, কেউ আমাকে খেয়াল করে দেখছে না। মানুষেরা মনে হয় দরকার না হলে উপরের দিকে তাকায় না। কেন তাকাবে, যা কিছু দরকার সবই তো নিচে মাটির সাথে! আমি এবারে আরো নিচে নেমে এলাম।

মাঠে গোল্লাছুট খেলছে বাচ্চারা, আমি একেবারে নিচে নেমে তাদের মাথার কাছ দিয়ে উড়ে আবার আকাশে উঠে গেলাম। বাচ্চাগুলো একেবারে হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি হাত নাড়লাম, সবাই হাত নাড়ল আমার দিকে। ছোট একটা বাচ্চা শুধু পিছনে পিছনে দুই হাত উপরে তুলে ছুটে আসতে থাকে, আমি উড়ব—আমি উড়ব—

আমার কী মনে হল জানি না, নিচে নেমে এসে বাচ্চাটার দুই হাত ধরে তাকে উপরে নিয়ে আসি। সেও ভাসতে থাকে আমার মতো, তখন সাবধানে ছেড়ে দিই তাকে। বাচ্চাটি ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে যায়, আমি উড়ে যাই সামনে। টুকুনজিলের অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

এবারে সব বাচ্চা হাত তুলে পিছনে পিছনে ছুটতে থাকে, আমি উড়ব—আমি উড়ব—আমি উড়ব।

কিন্তু আমার সময় নেই, দেরি হয়ে যাচ্ছে বাড়ি পৌঁছাতে। হাত নেড়ে নেড়ে বিদায় নিয়ে উড়ে উড়ে মেঘের আড়ালে লুকিয়ে গেলাম।

টুকুনজিল বলল, আমরা প্রায় এসে গেছি।

সত্যি?

হ্যাঁ, চিনতে পারছ না?

আমি নিচে তাকালাম, ঐ তো নীল গাঙ, ঐ তো নীল গাঙের পাশে স্কুলঘর, নীলাঞ্জনা হাই স্কুল। ঐ তো বড় সড়ক। ঐ তো দূরে আমাদের বাড়ি। বাড়ির পিছনে জঙ্গল। ঐ তো জঙ্গলের পিছনে জোড়া নারকেল গাছ। কখনো উপর থেকে দেখি নি, তাই প্রথমে চিনতে পারি নি।

আমি বললাম, টুকুনজিল, বাবাকে দেখতে পাও?

হ্যাঁ।

কোথায়?

একটা মাদারগাছের সামনে চুপ করে বসে আছেন।

কেউ কি আছে বাবার আশেপাশে?

না, নেই।

তাহলে আমাকে বাবার কাছে নামাও।

ঠিক আছে।

আমি এবারে শোঁ শোঁ করে নিচে নেমে আসি। স্কুলঘরের পাশে দিয়ে উড়ে নারকেলগাছের পাশে মাদারগাছের কাছাকাছি নেমে হঠাৎ বাবাকে দেখতে পেলাম। গালে হাত দিয়ে মাদারগাছের সামনে উবু হয়ে বসে আছেন। আমি কাছাকাছি আসতেই বাবা হঠাৎ কী মনে করে ঘুরে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পেলেন। আমি উড়ে এসে খুব ধীরে ধীরে বাবার সামনে নামলাম।

==

বাবা একটু হেসে বললেন, বিলু, বাবা তুই এসেছিস?

আমি যে আকাশে উড়ে এসেছি, সেটা দেখে বাবা একটুও অবাক হলেন না, মনে হল ধরেই নিয়েছেন আমি উড়ে আসব।

আমি বাবার হাত ধরে বললাম, বাবা, তোমার শরীরটা নাকি ভালো না?

কে বলেছে?

রাঙাবুবু।

রাণু? রাণুটা একেবারে বোকা। আমি একটা হাঁচি দিলেই মনে করে অনেক অসুখ।

বাবা মাদারগাছটার দিকে তাকিয়ে বললেন, যেতে হয় এখন, জনাব। ছেলেটা এসেছে এতদিন পরে, মায়ের কাছে নিয়ে যাই। বড় খুশি হবে।

আমি বাবার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, রাঙাবুবু লিখেছিল তুমি একেবারে বিছানায়, তুমি তো বেশ হাঁটছ, বাবা।

আমি একেবারে বিছানাতেই ছিলাম। মনে হচ্ছিল আর বুঝি বাঁচবই না। এই ঘন্টাখানেক আগে কী হল, হঠাৎ শুনি ঝিঁঝিপোকার ডাক, মনে হল যেন বুকের মাঝে কে জানি চিমটি কাটল। তারপর তুই বিশ্বাস করবি না, হঠাৎ মনে হল শরীরটা অনেক ঝরঝরে হয়ে গেছে। তুই আসবি বলেই মনে হয়।

টুকুনজিল। আমি বুঝে গেলাম বাবা কেমন করে হঠাৎ ভালো হয়ে গেছেন। টুকুনজিল বাবাকে ভালো করে দিয়েছে! নিশ্চয়ই তাই! সে জন্যে আমার সাথে রহস্য করছিল, বাবার কথা বলছিল না! আমি টুকুনজিলকে ডাকলাম কয়েকবার, নেই ধারে–কাছে। কে জানে আবার চট করে মঙ্গল গ্রহটা দেখতে গেছে কি না?

বাড়ির উঠানে আসতেই লাবু আমাদের দেখে ফেলল, তারপর চিৎকার করতে করতে বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল। এক সেকেন্ডের মাঝে বাড়ির ভেতর থেকে সবাই বের হয়ে এল, মা, রাঙাবুবু, বড়বুবু, বড়বুবুর ছোট ছেলেটা—সবাই। মা ছুটে এসে আমাকে একেবারে বুকে চেপে ধরলেন, বললেন, ইস, শরীরটা একেবারে শুকিয়ে গেছে।

রাঙাবুবু বলল, বিলু, তুই এখন কেমন করে এলি? ট্রেন তো আসবে সন্ধ্যেবেলা।

বাবা বললেন, উড়ে এসেছে।

রাঙাবুবু চোখ পাকিয়ে বলল, উড়ে এসেছে?

হ্যাঁ। কী সুন্দর উড়তে শিখেছে বিলু! একেবারে পাখির মতো। দেখলে অবাক হয়ে যাবি।

পাখির মতো?

হ্যাঁ, একেবারে পাখির মতো উড়তে পারে। বাবা ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিলু, একটু উড়ে দেখাবি এখন?

মা ধমক দিলেন বাবাকে, চুপ করেন তো আপনি।

বাবা আমার দিকে তাকিয়ে দুর্বলভাবে হেসে বললেন, দেখলি বিলু, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তুই চলে যাবার পর আমার আর কথা বলার মানুষ নেই।

মা বললেন, বিলু বাবা যা, হাত–পা ধুয়ে আয়, খাবি।

আমি একটা গামছা নিয়ে বের হয়ে গেলাম, কে জানে কলতলায় দুলালকে পেয়ে

যাব কি না, আমাকে দেখে কী অবাক হয়ে যাবে! হঠাৎ টুকুনজিলের কথা শুনতে পেলাম, বিলু? তুমি এখান থেকে চলে গিয়েছিলে কেন? এরা সবাই তোমাকে কী অসম্ভব ভালবাসে! তরঙ্গ কম্পন চার দশমিক সাতের মাঝে—

ভালবাসবে না কেন? আমার মা–বাবা ভাই–বোন—

তাহলে তুমি চলে গেলে কেন?

এই তো ফিরে এসেছি, আর যাব না।

হ্যাঁ, যেও না।

টুকুনজিল, আমি একটু আগে তোমাকে ডেকে পাই নি।

আমার মহাকাশযানটার কিছু জিনিস ঠিক করতে হল।

ঠিক হয়েছে?

হ্যাঁ।

টুকুনজিল, তুমি বাবার শরীর ঠিক করে দিয়েছ, তাই না?

পুরোপুরি ঠিক করি নি, হৃৎপিণ্ডের একটা ধমনীতে কিছু সমস্যা ছিল, সেটা ঠিক করে দিয়েছি। তুমি কি চাও অন্য সমস্যাগুলোও সারিয়ে দিই?

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে তুমি? মাথা–খারাপটা সারিয়ে দিতে পারবে?

মাথা–খারাপ? তোমার বাবার মাথা–খারাপ?

হ্যাঁ। দেখ না, গাছপালা, পশুপাখির সাথে কথা বলেন?

সেটা কি মাথা–খারাপ? পশুপাখিরা তো খুব নিম্ন বুদ্ধিবৃত্তির প্রাণী, কিন্তু তারাও তো চিন্তা করে, নিজেদের নিম্ন বুদ্ধিবৃত্তির চিন্তা। তোমার বাবা সেটা হয়তো অনুভব করতে পারেন। আমি যেরকম করি। এটা একটা ক্ষমতা—

কচু ক্ষমতা! দরকার নেই এই ক্ষমতার। তুমি বাবাকে ভালো করে দাও।

ঠিক আছে, যাবার আগে তোমার বাবাকে ভালো করে দেব।

যাবার আগে? কোথায় যাবার আগে?

আজকে আমার ফিরে যেতে হবে, মনে নেই?

তাই তো! টুকুনজিল, তুমি চলে যাবে?

হ্যাঁ, বিলু।

আমার মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল।

১৬. বিদায়

গভীর রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, টুকুনজিল আমাকে ডাকছে। আমি উঠে বসি বিছানায়। রাঙাবুবু ঘুমিয়ে আছে বিছানায় ক্লান্ত হয়ে, অন্যপাশে লাবু। সাবধানে বিছানা থেকে নেমে আমি দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আকাশে মস্ত একটা চাঁদ উঠেছে তার নরম জোছনায় চারদিকে কী সুন্দর কোমল একটা ভাব। বারান্দায় জলচৌকিতে আমি চুপচাপ বসে রইলাম। টুকুনজিল ডাকল আমাকে, বিলু।

বল।

==

আমার কেন জানি যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে এখানে থেকে যাই।

টুকুনজিল, আমারও তাই ইচ্ছে করছে।

কিন্তু আমার তো যেতে হবে জান। এখানে থেকে যাওয়া তো খুব অযৌক্তিক ব্যাপার। তাই না?

হ্যাঁ।

তবু মনে হচ্ছে থেকে যাই। মনে হচ্ছে তোমাকে নিয়ে আকাশে উড়ে বেড়াই।

আমি চুপ করে রইলাম।

কিন্তু আমার যেতে হবে। যেতে ইচ্ছে করছে না, তবু যেতে হবে। খুব বিচিত্র একটা অনুভূতি। খুব বিচিত্র। এর কি কোনো নাম আছে বিলু?

হ্যাঁ, আছে।

কি নাম?

মন-খারাপ। দুঃখ।

দুঃখ। আমার খুব দুঃখ হচ্ছে, বিলু।

আমি কোনো কথা না বলে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে উঠলাম।

টুকুনজিল বলল, তুমি কেঁদো না বিলু। কেঁদো না। কেউ কাঁদলে কী করতে হয় আমি জানি না।

আমি শার্টের হাতা দিয়ে আমার চোখ মোছার চেষ্টা করলাম। টুকুনজিল আবার বলল, আমি যখন ফিরে যাব তখন আমার গ্রহের সবাইকে বলব, ছায়াপথে ছোট্ট একটা নক্ষত্র আছে—তার নাম সূর্য। সেই নক্ষত্রে ছোট্ট একটা গ্রহ আছে তার নাম পৃথিবী। সেই পৃথিবীতে ছোট্ট একটা মানুষ আছে, তার নাম বিলু। সেই বিলুর সাথে আমার ভাব হয়েছিল। সেই বিলু আমাকে খুব আশ্চর্য একটা জিনিস শিখিয়েছে, সেটার নাম ভালবাসা। আমাকে সে এত ভালবেসেছে যে হঠাৎ করে আমার বুকের ভেতরেও সেই আশ্চর্য অনুভূতির জন্ম হয়েছে। আমি একটা আশ্চর্য জিনিস বুকে করে নিয়ে যাচ্ছি বিলু। আমি তোমাকে কোনো দিন ভুলব না।

আমিও ভুলব না, টুকুনজিল।

আবার যখন আসব, আমি তখন তোমাকে খুঁজে বের করব।

কখন আসবে তুমি?

সময় সংকোচনের পঞ্চম পর্যায়ের তৃতীয় তরঙ্গে।

সেটা কবে?

এক শ' তিরিশ বছর পরে।

এক শ' তিরিশ! আমি ততদিনে মরে ভূত হয়ে যাব।

তোমার সন্তানেরা থাকবে। কিংবা তাদের সন্তানেরা। আমি তাদের খুঁজে বের করে তোমার কথা বলব।

ঠিক আছে টুকুনজিল।

আমার যাবার সময় হয়েছে বিলু। যাবার আগে তুমি কি আমার কাছে কিছু জানতে চাও?

কি জানতে চাইব?

কোনো পরম জ্ঞান? মহাকর্ষ ও নিউক্লিয়ার বলের সংমিশ্রণ? সর্বশেষ প্রাইম

সংখ্যা? আলোর প্রকৃত বেগ? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমা? কোনো মহাসত্য?

না টুকুনজিল, জানতে চাই না। তুমি তো বলেছ জানে কোনো শর্টকাট নেই।

তাহলে কি তোমাকে বলে যাব কেমন করে সমুদ্রের পানি থেকে সোনা বের করতে হয়? বালু থেকে কেমন করে ইউরেনিয়াম বের করতে হয়? বলব?

না টুকুনজিল। আমি কিছু চাই না।

কিছু চাও না?

না, শুধু চাই তুমি যেন ভালো থাক। যেখানে থাক ভালো থেকো।

বিলু।

বল।

আমাকে বিদায় দাও, বিলু।

তুমি কোথায়?

এই যে আমি, তোমার হাতের উপর বসে আছি।

আমার হাতের উপর হালকা নীল আলোর একটা বিন্দু। আমি ভালোবেসে স্পর্শ করে বললাম, বিদায়।

টুকুনজিলের মহাকাশযান থেকে নীল বিদ্যুৎচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ে। আমার হাত থেকে সেটা উপরে উঠে আসে, তারপর আমাকে ঘিরে সেটা ঘুরতে শুরু করে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর দ্রুত, দ্রুত থেকে দ্রুততর। ঝিঁঝিপোকার মতো একটা শব্দ হয়, তারপর হঠাৎ করে নীরব হয়ে যায় চারদিকে।

টুকুনজিল চলে গেছে। বুকের ভেতর কেমন জানি ফাঁকা ফাঁকা লাগতে থাকে আমার।

দরজা খুলে হঠাৎ বাবা বের হয়ে আসেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাঁদের দিকে তাকালেন, তারপর দু' হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। আমাকে দেখতে পান নি বাবা, হঠাৎ দেখলেন, দেখে চমকে উঠে বললেন, কে? কে ওটা?

আমি, বাবা।

বিলু তুই?

হ্যাঁ বাবা।

বাইরে বসে আছিস কেন?

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাই।

বাবা এসে আমার পাশে বসলেন। জোরে জোরে কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, কী সুন্দর ফুলের গন্ধ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাবা, তোমার শরীরটা কেমন লাগছে এখন?

শরীর? কেমন জানি হালকা হালকা লাগছে, মনে হচ্ছে বয়স কুড়ি বছর কমে গেছে হঠাৎ। একেবারে অন্যরকম লাগছে। খুব ভালো লাগছে শরীরটা। খুব ভালো। তুই এসেছিস বলেই মনে হয়।

রাতজাগা একটা পাখি হঠাৎ কঁক্‌কঁক্ করে ডেকে উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে। আমি চমকে উঠে বললাম, বাবা, শুনলে?

==

হ্যাঁ। ওটা কিছু না। পাখি।

পাখিটা কি বলছে, বাবা?

বাবা শব্দ করে হাসলেন। বললেন, ধূর বোকা। মানুষ কি কখনো পাখির কথা বুঝতে পারে?

আমি শক্ত করে বাবাকে আঁকড়ে ধরে সাবধানে চোখের পানি মুছে নিলাম। টুকুনজিল আমার বাবাকে ভালো করে দিয়ে গেছে।

টুকুনজিল। তুমি যেখানেই থাক, ভালো থেকো।

শেষ কথা

আমি নীলাঞ্জনা হাই স্কুলেই আছি। বেশ ভালোই আছি। সারা দিন স্কুল করে বিকেলে কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে ফুটবল খেলি। তারপর দলবেঁধে বড় দিঘিতে লাফিয়ে পড়ি। হৈচৈ করে সাঁতার কেটে গোসল করি, ডুব-সাঁতার দিয়ে এক জন আরেকজনের পা ধরে টানাটানি করি, তারি মজা হয় তখন।

ছুটির দিনে আমি আর দুলাল হেঁটে হেঁটে সদরের বড় লাইব্রেরিতে যাই, এই লাইব্রেরিটা অনেক বড় আর কত যে মজার মজার বই। লাইব্রেরিয়ানের সাথে আমার খুব ভালো পরিচয় হয়ে গেছে, আমি তাই একবারে অনেকগুলো করে বই নিতে পারি। বইগুলো বুকে চেপে ধরে আমি আর দুলাল বড় সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে ফিরে আসি। দু'পাশে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায়, ধানের শিষ ঢেউয়ের মতো নাচতে থাকে, তখন কী যে ভালো লাগে আমার। আমি আর দুলাল সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে কত রকম গল্প করি, বড় হয়ে কি করব এইসব।

ব্ল্যাক মার্ডারের দলবল একবার আমার কাছে বেড়াতে এসেছিল টুকুনজিলের গল্প শুনতে। স্যার নিয়ে এসেছিলেন, সবাই মিলে কী যে মজা হল তখন। আমি আর দুলাল ব্ল্যাক মার্ডারের দলকে সবকিছু ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালাম, কেমন করে জাল দিয়ে মাছ ধরতে হয়, কেমন করে গরুর দুধ দোয়াতে হয়, কেমন করে নৌকা বাইতে হয়, কেমন করে ক্ষেতে মই দিতে হয়। বিকেলে রাঙাবুবু সবাইকে খই ভেজে দিল দেখে সবাই এত অবাক হয়ে গেল যে বলার নয়। নান্টু তো ফিরে যেতেই চাইছিল না, তারিক বলল, সে তার বাবাকে বলবে নীলাঞ্জনা হাই স্কুলে বদলি হয়ে আসতে চায়। আমাদের বাড়ি থেকে পড়াশোনা করবে।

স্যার আমার সাথে পড়াশোনা নিয়ে অনেক কথা বললেন। আমার বইপত্র বাড়ির কাজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। সাথে অনেকগুলো বই এনেছিলেন, গল্পের বই নয়, পড়ার বই, সেগুলো বুঝিয়ে দিলেন। ঘরে বসে নিজে নিজে কেমন করে পড়তে হয় তার উপর বই।

রাতে উঠানে বড় আগুন জ্বালিয়ে সবাই গোল হয়ে বসেছিলাম, আমি তখন টুকুনজিলের গল্প করছি সবাইকে। কেমন করে টুকুনজিলের দেখা পেলাম, কেমন করে না বুঝে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশিতে তাকে আটকে রাখলাম, কেমন করে পিঁপড়ারা তাকে ঠিক করে দিল, কেমন করে সোনার আংটি চুরি করে আমি কী

বিপদে পড়লাম! তারপর বব কার্লোসের কথা বললাম, তারা বিষাক্ত ওষুধ দিয়ে আমাকে কেমন কষ্ট দিল শুনে রাঙাবুবু আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে থাকে। তারপর যখন টুকুনজিল কী ভাবে ঘর ভেঙে আমাকে উদ্ধার করে আনল সেটা বললাম, সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। এর পরের অংশটা ব্ল্যাক মার্ডারের দলের সবাই জানে, তবুও আবার বললাম, সবাই যোগ দিল আমার সাথে। নান্টু আর তারিক অভিনয় করে দেখাল কেমন করে ভয়ঙ্কর মারপিট হল মেশিনগান হাতে সেই লোকের সাথে। সেই লোক কী ভাবে আছাড় খেয়ে পড়ল তার অভিনয়টা এত ভালো হল যে সেটা নান্টু আর তারিককে দু'বার করতে হল। সবাই হেসে কুটিকুটি হল তখন। তারপর বব কার্লোসকে ঝুলিয়ে রেখে আমরা কেমন করে পালিয়ে এলাম সেটা বললাম আমি। খালার বাসায় এসে রাঙাবুবুর চিঠি পড়ে আমার কী মন-খারাপ হল, তখন টুকুনজিল কেমন করে আমাকে আকাশে উড়িয়ে আনল সেটা বললাম। টুকুনজিল কেমন করে বিদায় নিল, সেটা বলতে গিয়ে আমার গলা ধরে এল, সবার চোখে পানি এসে গেল তখন।

গল্প শেষ হবার পর অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলল না। অনেকক্ষণ পর স্যার বললেন, বিলু, এত বড় একটা ব্যাপার, কিন্তু তুই যে কী ভালোভাবে এটা সামলেছিস, তার কোনো তুলনা নেই। মহাকাশের সেই প্রাণী পৃথিবী সম্পর্কে কী ভালো একটা ধারণা নিয়ে গেল, বুকে করে কত ভালবাসা নিয়ে ফিরে গেল। আহা!

বাবা শুধু মাথা নেড়ে বললেন, এটা কি কখনো হতে পারে যে কেউ মহাকাশের একটা প্রাণীকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শিশির মাঝে আটকে রাখবে? হতে পারে? বিলুটা যা গুল মারতে পারে!

নান্টু, তারিক, সুব্রত সবাই একসাথে চিৎকার করে বলল, কী বলছেন চাচা আপনি? আমরা নিজের চোখে দেখেছি।

তারপর অনেক দিন হয়ে গেছে। এখনো মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ কোনো মানুষ আমার খোঁজে আসে। কেউ এদেশের, কেউ বিদেশের। তারা আমার কাছে টুকুনজিলের কথা শুনতে চায়। নানারকম প্রশ্ন করে। ঘুরেফিরে সবাই শুধু একটা জিনিস জানতে চায়, ফিরে যাবার আগে টুকুনজিল কি কোনো প্রমাণ রেখে গেছে? কোনো চিহ্ন? কোনো তথ্য? কোনো অজানা সত্য? কোনো ভবিষ্যদ্বাণী?

আমি তখন বলি রেখে যায় নি, তখন সবাই আমার দিকে কেমন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকায়। আমি বুঝতে পারি, আমার কথা তারা ঠিক বিশ্বাস করছে না।

আমি কিছু মনে করি না। বিশ্বাস না করলে নাই। আমি জানি, টুকুনজিল আছে। কেউ বিশ্বাস করলেও আছে, না করলেও আছে।

রাতে যখন আকাশভরা নক্ষত্র ওঠে, আমি তখন এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জকে খুঁজে বেড়াই, আমি জানি সেই নক্ষত্রপুঞ্জের কোনো একটি নক্ষত্রের কোনো একটি গ্রহে আছে আমার এক বন্ধু। আমি জানি যখন তার আকাশ ভরে নক্ষত্র উঁকি দেয়, সেও ছায়াপথের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তাকিয়ে সে আমার কথা ভাবে।

আমি যেরকম করে তার কথা ভাবি।